এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(পঞ্চম খণ্ড)

মূল ঃ
হুজ্জাতুল ইসলাম
ইমাম গাযযালী (রহঃ)

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা
সহযোগিতায় ঃ মাওলানা আবদুল আজীজ (রহঃ)

মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন—পঞ্চম খণ্ড
মূল ঃ ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪১৫ হিজরী
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪২০ হিজরী
আষাঢ় ঃ ১৪০৬ বাংলা
জুলাই ঃ ১৯৯৯ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ
অরণি কম্পিউটার্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা— ১১০০

হাদিয়া ১২০ টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্‌যালীর (রহঃ) (৪৫০ হিঃ— ৫০৫ হিঃ) রচিত অমর গ্রন্থ "এহইয়াউ উলুমিদ্দীন"-এর পঞ্চম তথা শেষ খণ্ডের অনুবাদ পাঠকগণের খেদমতে পেশ করা হল। প্রায় নয়শ' বছর আগে এ মহান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটি একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থরূপে সমগ্র বিশ্বে সমভাবে পঠিত ও সমাদৃত। মানব রচিত দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থ এরূপ সমাদৃত হওয়ার নযীর আছে কি না, তা আমাদের জানা নেই। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক ও দার্শনিক ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) মহান আল্লাহর নিকট কতটুকু মকবুলিয়ত অর্জন করেছিলেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোই তা প্রমাণ করে। এ মহান সাধক সম্পর্কে অনেক মনীষীরই মন্তব্য হচ্ছে যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) হচ্ছেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি আশ্চর্য মু'জেযাবিশেষ। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের উম্মত যাতে গোমরাহ না হয়, সেজন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগেই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন যেসব লোক সৃষ্টি করবেন বলে হাদীস শরীফে সুসংবাদ রয়েছে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) ছিলেন তারই অন্যতম বাস্তব নমুনা।

'এহ্‌ইয়াউ উলুমিদ্দীন' অর্থ, ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের নবজীবন দান। কিতাবখানি তার নামের কতটুকু সার্থকতা দান করেছে, সেকথা ব্যাখ্যার মোটেও প্রয়োজন করে না।

'এহইয়ার' অনেকগুলো ব্যাখ্যা-গ্রন্থ এবং পৃথিবীর বহু ভাষায় এর অনুবাদ, টীকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এক শ্রেণীর স্থূলবুদ্ধির লোক অবশ্য এ মহান গ্রন্থের সমালোচনাও করেছে। তাদের অভিযোগ হচ্ছে, ইমাম সাহেব এ গ্রন্থে যে অসংখ্য হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, এগুলো কোন্ কিতাব থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন, তা যেমন লিখেননি, তেমনি কোন সনদ বা বর্ণনাসূত্রও উল্লেখ করেননি। ফলে, হাদীসগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত তাঁর প্রকাশভঙ্গি ওয়ায়েয সুলভ তাঁর আগে কেউ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এরূপ ধারা অবলম্বন করেননি। যার ফলে তাঁর বক্তব্য অনেকটা গাম্ভীর্য হারিয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব অভিযোগ একেবারেই অর্থহীন। কারণ, গাযযালী (রহঃ) নিজেই ছিলেন একজন স্বীকৃত ইমাম। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সনদসূত্র ছিল। তাঁর

উস্তাদ ইমামুল হারামাইন আল্লামা জোয়াইনী (রহঃ) থেকে শুরু করে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সে সূত্রটি ছিল এতই প্রসিদ্ধ যে, প্রতিটি হাদীসের সাথে সে বর্ণনা সূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

দ্বিতীয়ত, বর্ণনাভঙ্গির ক্ষেত্রে ইমাম গায্যালী (রহঃ) যে অনন্য রীতিটি অবলম্বন করেছেন এটা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। পূর্ববর্তী রচনাশৈলীর সাথে এর মিল না থাকাটা বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত নয় কোনক্রমেই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম গায্যালীর (রহঃ) এ পুস্তক পৃথিবীর সব কয়টি উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এহইয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থটিরও পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অনুবাদ দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। বাংলা ভাষায় এহইয়ার অনুবাদ ইতিপূর্বে হয়েছে। তারপরও আমি কেন পুনরায় এ মহান গ্রন্থটি অনুবাদে হাত দিলাম, সে কৈফিয়ত দিতে চাই না। বিজ্ঞ পাঠকগণই তা অনুভব করতে পারবেন। তাছাড়া, মুসলিম জনগণের নিত্যপাঠ্য এ মহান গ্রন্থটির প্রচার-প্রসার যত বেশী হয়, ততই সেটা কল্যাণকর বলে আমার ধারণা।

অনুবাদ যথাসাধ্য মূলানুগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কতটুকু সফল হয়েছি সে বিচারও পাঠকগণই করবেন।

আল্লাহর রহমতে গ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সমাপ্ত হলো।

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাজনিত কারণে আমি নিজে প্রুফ সংশোধন করতে পারি না। তাছাড়া আমার শক্তিও নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সুতরাং অনুবাদ বা মুদ্রণে ভুল-ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিজ্ঞজনদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যে কোন ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে দরদের সাথে জানিয়ে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার সুযোগ অবশ্যই দিবেন। এতদসঙ্গে সকলের দোয়া চাই, আল্লাহ পাক যেন এ ধরনের কাজ আরো অধিক পরিমাণে করার তাওফীক দান করেন।

বিনীত

রবিউল আউয়াল ১৪২০ হিঃ

মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুল ধর্মের মনযিলসমূহের মধ্যে একটি মনযিল এবং বিশ্বাসের মকামসমূহের মধ্যে অন্যতম মকাম। এটি জানার দিক দিয়ে যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, আমলের দিক দিয়েও তেমনি কঠিন। জানার দিক দিয়ে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণ, উপায়-উপকরণ ও কারণাদির উপর ভরসা করা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের পরিপন্থী এবং শিরকের নামান্তর। আবার এগুলো থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও শরীয়তের উপর আপত্তি উঠে। সুতরাং কারণাদির প্রতি দৃষ্টি না দেয়া এবং এগুলোর উপর ভরসাও করা— এ বিষয়টি দুর্বোধ্য। তাই তাওয়াক্কুলের অর্থ এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করা, যা তাওহীদেরও অনুকূল এবং বিবেক ও শরীয়তের সাথেও সামঞ্জস্যশীল হয়, নেহায়েত কঠিন ও সূক্ষ্ম ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে যে সকল আলেমের দৃষ্টিতে বস্তুনিচয়ের স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে, তাঁদের ছাড়া এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার সাধ্য কারও নেই। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন আলেমগণ দেখে জেনে নিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দ্বারা যেভাবে বর্ণনা করিয়েছেন, তাঁরা সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।

আমরা এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখানে একটি ভূমিকা ও দু'টি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করব। ভূমিকায় তাওয়াক্কুলের ফযীলত এবং প্রথম পরিচ্ছেদে তাওহীদ ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ভূমিকা

তাওয়াক্কুলের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْآ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

অর্থাৎ, ভরসাকারীদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

অর্থাৎ, যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।

সুতরাং সেই মকামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাসাপেক্ষ নয়, সেখানে পৌঁছলে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়। যার জন্যে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট হন এবং যাকে তিনি ভালবাসেন, সে অত্যন্ত সফলকাম। কেননা, যাকে ভালবাসা হয়, তার আযাব হবে না এবং সে দূরে ও অন্তরালে থাকবে না। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

অর্থাৎ, আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন?

এ থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যথেষ্ট মনে করবে, সে তাওয়াক্কুল বর্জনকারী হবে। আরও এরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ, যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

অর্থাৎ, তিনি এমন শক্তিধর যে, কেউ তাঁর আশ্রয়ে এলে তিনি তাকে লাঞ্ছিত করেন না। আর তিনি এমন কৌশলী যে, কেউ তাঁর কৌশলের উপর ভরসা করলে তিনি তাকে নিরাশ করেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের এবাদত কর, তারা তোমাদের মতই বান্দা।

এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত সবাই তোমাদের মত অভাবগ্রস্ত। অতএব, তাদের উপর কেমন করে ভরসা করা যায়? আরও এরশাদ হয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ –

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা কর, তারা তোমাদের রুযীর মালিক নয়। অতএব, তোমরা আল্লাহর কাছে রুযী অন্বেষণ কর এবং তাঁর এবাদত কর। অন্যত্র বলা হয়েছে—

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ

অর্থাৎ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহরই; কিন্তু কপট বিশ্বাসীরা তা বুঝে না।

এসব আয়াত ছাড়াও কোরআন মজীদে তাওহীদ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতসমূহে একথাই বলা হয়েছে যে, অন্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রবল প্রতাপশালী এক আল্লাহর উপরই ভরসা কর।

হাদীস গ্রন্থসমূহেও তাওয়াক্কুল সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে হজ্জের মওসুমে উম্মতসমূহ দেখানো হয়েছে। আমি আমার উম্মতকে দেখেছি, তাদের দ্বারা সকল পাহাড় -পর্বত, উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি ভর্তি হয়ে গেছে। তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকেনি। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হল ঃ তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। অতঃপর বলা হল ঃ এদের সাথে আরও সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা কারা? তিনি বললেন ঃ যারা অঙ্গে দাগ দেয় না, ভাবী শুভাশুভ বিশ্বাস করে না এবং নিজের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। একথা শুনে ওকাশা ইবনে মুহসিন দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ

আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ আমার জন্যেও দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ এ দোয়ায় ওকাশা অগ্রগামী হয়ে গেছে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে— যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর যথার্থ ভরসা কর, তবে আল্লাহ পাখিদের মত তোমাদেরকেও রিযিক দেবেন। পাখিরা ভোরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় নীড় ত্যাগ করে এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من انقطع الى الله عز وجل كفاه الله تعالى كلى مؤنة ويرزقه من حيث لايحتسب ومن انقطع الى الدنيا وكله الله اليها ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ তা'আলার হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে যাবতীয় পরিশ্রম থেকে রক্ষা করেন এবং ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার হাতেই ছেড়ে দেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি সবার চাইতে অধিক বিত্তবান হওয়া পছন্দ করে, তার উচিত নিজের সামনের বস্তুর তুলনায় আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী বস্তুর উপর অধিক ভরসা করা। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবারের লোকজন যখন উপবাসের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তিনি আরও বলতেন ঃ আমার পরওয়ারদেগার আমাকে এ নির্দেশই করেছেন। সেমতে কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا -

অর্থাৎ, আপনি আপনার পরিবারবর্গকে নামাযের নির্দেশ দিন এবং আপনি তাতে অটল থাকুন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— যে তাবীযগণ্ডা করায়, সে তাওয়াক্কুল করে না। অর্থাৎ, কোরআন মজীদ ও শরীয়তের সাধারণ নীতি অনুযায়ী তাবীযগণ্ডা করানো যদিও জায়েয; কিন্তু এদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করা তাওয়াক্কুলের দাবী।

কথিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন ঃ আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়। একথা বলার কারণ এই যে, তাঁকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য ধরা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

অর্থাৎ, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি চমৎকার কার্যনির্বাহী।

এ উক্তি বাস্তবায়িত করার জন্যেই তিনি জিবরাঈলকে একথা বলেছিলেন। তাঁর এই কথা রক্ষা করার প্রতি ইঙ্গিত করেই কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى

অর্থাৎ, সেই ইবরাহীম, যে তার কথা রক্ষা করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, হে দাউদ! যে ব্যক্তি কেবল আমার মযবুত রশি ধারণ করবে, মানুষের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না, তার সাথে নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই প্রবঞ্চনা করলেও আমি তার নিষ্কৃতির পথ বের করে দেব।

তাওয়াক্কুল সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি এই যে, একবার হযরত ইবরাহীম খাওয়াস এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ -

অর্থাৎ, আল্লাহর উপর ভরসা কর, যিনি চিরজীবী— কখনও মৃত্যুবরণ করেন না।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ এ আয়াতের পর আল্লাহ ছাড়া আর কারো

কাছে ভিক্ষা চাওয়া বান্দার উচিত নয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ মানবের পক্ষে নিন্দনীয় রিযিকের অন্বেষণে নিজের ফরয কর্ম থেকে গাফেল হয়ে পড়া এবং পরকালের অধঃপতন ডেকে আনা উচিত নয়। সে দুনিয়াতে রিযিক ততটুকুই পাবে, যতটুকু লিখা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যখন মানুষের কাছে অন্বেষণ ছাড়াই রিযিক আসে, তখন বুঝা যায়, রিযিকের প্রতিও মানুষ খুঁজে নেয়ার নির্দেশ রয়েছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ আমি জনৈক দুনিয়াত্যাগী দরবেশকে প্রশ্ন করলাম ঃ তুমি কোথা থেকে রিযিক খাও? সে বলল ঃ এটা আমার জানার বিষয় নয়। পরওয়ারদেগারকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কোথা থেকে আমাকে খাওয়ান? হরম ইবনে হাব্বান হযরত ওয়ায়েস করনীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কোথায় থাকেন? তিনি সিরিয়ার দিকে ইশারা করলেন। হরম প্রশ্ন করলেন ঃ জীবিকা কিভাবে চলে? তিনি বললেন ঃ সে সব অন্তরের জন্যে পরিতাপ, যাতে সন্দেহ মিশ্রিত রয়েছে। উপদেশে তাদের কি উপকার হবে?

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাওহীদের মাহাত্ম্য

জানা থাকা দরকার যে, ঈমানের প্রকারসমূহের মধ্যে তাওয়াক্কুলও একটি। এর মূল হচ্ছে এলম তথা জ্ঞান। এর ফলাফল হচ্ছে, আমল তথা কর্ম। এরপর তাওয়াক্কুল শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ হচ্ছে এর হাল বা অবস্থা। এখানে আমরা তাওয়াক্কুলের মূল জ্ঞান সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করব। মূল অভিধানে এটাই ঈমান। কেননা, ঈমানের অর্থ তাসদীক তথা সত্যায়ন করা। যে সত্যায়ন অন্তরের অন্তস্তল থেকে হয়, তাই জ্ঞান। ঈমানের প্রকার অনেক। কিন্তু আমরা সে সব প্রকার বর্ণনা করব, যেগুলোর উপর তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার তাওহীদ, যা পবিত্র এই কলেমা থেকে বুঝা যায়।

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ

অর্থাৎ, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করা, যা له الملك বাক্যে বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাম্রাজ্য তাঁরই। তৃতীয় প্রকার আল্লাহর দানশীলতা ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাস করা, যা لَهُ الْحَمْدُ বাক্য থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে ঃ

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

অর্থাৎ, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, তার ঈমান পূর্ণ হয়ে যায়, যা তাওয়াক্কুলের মূলভিত্তি।

বলা বাহুল্য, তাওহীদের চারটি স্তর রয়েছে— এক, সারাংশ, দুই, সারাংশের সারাংশ, তিন, বাকল এবং চার, বাকলের উপরকার বাকল। অজ্ঞ লোকদেরকে বুঝাবার জন্যে আমরা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। তাওহীদকে একটি আখরোটের উপরকার বাকল মনে করা উচিত। আখরোটের উপরিভাগে উপর-নিচে দু'টি বাকল থাকে, একটি সারাংশ থাকে এবং সারাংশে থাকে তৈল। সুতরাং তাওহীদের প্রথম স্তর হচ্ছে আখরোটের উপরকার বাকল। তা হচ্ছে শুধু মুখে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ করা, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে গাফেল থাকা কিংবা মনে মনে তা অস্বীকার করা—এটা হচ্ছে মুনাফিক তথা কপট বিশ্বাসীদের তাওহীদ। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে মুখে কলেমা উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা। এটা হচ্ছে সাধারণ জনগণের তাওহীদ। তৃতীয় স্তর হচ্ছে সত্যের নূরের মাধ্যমে কলেমার অর্থ স্বর্গীয় প্রেরণায় প্রকটিত হওয়া এবং তা প্রত্যক্ষ করা। এটা নৈকট্যশীলদের তাওহীদ। চতুর্থ স্তর এই যে, অস্তিত্ব জগতে এক ও অভিন্ন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু না দেখা। এটা সিদ্দীকগণের তাওহীদ। সূফী-বুযুর্গগণের পরিভাষায় এর নাম "ফানা ফিত্তাওহীদ" (তাওহীদে বিলুপ্তি)। কারণ, এই স্তরে ব্যক্তি যেখানে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া কিছুই দেখে না, সেখানে নিজের অস্তিত্বকেও দেখে না। সুতরাং তার সত্তা নিজের চোখেও বিলুপ্ত থাকে।

উপরোক্ত স্তর চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কেবল মৌখিক তাওহীদপন্থী। তার তাওহীদের উপকারিতা কেবল দুনিয়াতেই পাবে। অর্থাৎ সে মুজাহিদদের তরবারি থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এই অর্থে তাওহীদপন্থী যে, সে কলেমার অর্থ বুঝে এবং অন্তর দ্বারা তা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে না। এ ধরনের তাওহীদ অন্তরের উপর এক গ্রন্থিবিশেষ, যাতে উন্মোচন ও উদ্দীপনা হয় না। এতদসত্ত্বেও এই তাওহীদ দ্বারা আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, যদি এর উপরই জীবনাবসান হয় এবং গোনাহের কারণে তা দুর্বল না হয়। এই গ্রন্থিকে ঢিলে করার ও খুলে দেয়ারও কতকগুলো কৌশল রয়েছে। সেগুলোকে "বেদআত" বলা হয়। আরও কিছু পন্থা রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা এই গ্রন্থিকে মযবুত করা ও ঢিলেকারীদের কৌশল প্রতিহত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এসব পন্থাকে বলা হয় "কালাম শাস্ত্র"। যে কালাম শাস্ত্র জানে, তাকে মুতাকাল্লিম এবং তার বিপরীতকে মুবতাদে' বলা হয়। জনসাধারণের অন্তর থেকে তাওহীদের গ্রন্থি খুলে ফেলার জন্য মুবতাদে' যে অপচেষ্টা চালায়, তা ব্যর্থ করে দেয়াই মুতাকাল্লিমের লক্ষ্য থাকে।

তৃতীয় ব্যক্তি এই অর্থে তাওহীদপন্থী যে, সে বিশ্ব-জাহানের হর্তাকর্তা একজনকেই বিশ্বাস করে। সে যদিও জানে, বস্তু সামগ্রী অনেক; কিন্তু এই প্রাচুর্য সত্ত্বেও সেগুলোকে সে এক পরাক্রমশালী আল্লাহ থেকেই প্রকাশিত বলে জানে।

চতুর্থ ব্যক্তি এই অর্থে তাওহীদপন্থী যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। সে বস্তুসামগ্রীকে বহুত্বের দৃষ্টিতে নয়; বরং একত্বের দৃষ্টিতে দেখে। এটি তাওহীদের সর্বোচ্চ স্তর।

অতএব, প্রথম স্তর হচ্ছে আখরোটের উপরের ছাল, দ্বিতীয় স্তর দ্বিতীয় ছাল, তৃতীয় স্তর সারাংশ এবং চতুর্থ স্তর তৈলের ন্যায়, যা সারাংশ থেকে নির্গত হয়। উপরের ছাল কোন উপকারে আসে না। খেলে তিক্ত লাগে। আগুনে নিক্ষেপ করলে আগুন নিভিয়ে দেয় এবং ধোঁয়া বৃদ্ধি করে। ঘরে রাখলে অহেতুক জায়গা আবদ্ধ রাখে। মোটকথা, কয়েকদিন আখরোটের হেফাযত করা ছাড়া এটা কোন কাজে লাগে না। সারাংশ বের করে ফেললে এটা ফেলে দেয়া হয়। মৌখিক তাওহীদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। এরূপ তাওহীদে উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী। স্বল্পকালীন উপকার এই যে, মন ও দেহকে রক্ষা করার জন্যে মৃত্যু পর্যন্ত কাজে লাগে এবং মুনাফিকের দেহকে মুজাহিদদের তরবারির গ্রাস হতে দেয় না। কারণ, তাদের প্রতি অন্তর চিরে দেখার নির্দেশ নেই। তারা কেবল বাহ্যিক ইসলামকে দেখে। কিন্তু মৃত্যুর সময় এই তাওহীদ তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাজে আসবে না।

আখরোটের দ্বিতীয় ছাল প্রথম ছালের তুলনায় বাহ্যত উপকারী। এর দ্বারা সারাংশের হেফাযত হয় এবং রেখে দিলে সারাংশকে বিগড়ে যেতে দেয় না। পৃথক করে নিলে জ্বালানি কাজেও আসে। কিন্তু এই উপকার সর্বাবস্থায় সারাংশের তুলনায় কম। এমনিভাবে অন্তরে কেবল কলেমার অর্থের বিশ্বাস রাখা মৌখিক কলেমার তুলনায় অনেক উপকারী। কিন্তু কাশফ ও প্রত্যক্ষকরণের তুলনায় এর মান কম। কাশফ ও প্রত্যক্ষকরণের ফলস্বরূপ যে উন্মোচন ও প্রশস্ততা অর্জিত হয়, তাই নিম্নোক্ত আয়াতে বুঝানো হয়েছে—

فمن يرد الله ان يهد يه يشرح صدره للاسلام

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মোচিত করে দেন।

এ আয়াতেও তাই উদ্দেশ্য—

افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه –

অর্থাৎ, আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মোচিত করে দিয়েছেন, সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কি নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে?

সারাংশ স্বয়ং ছালের তুলনায় উৎকৃষ্ট এবং এটাই প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য। তবু তৈল বের করার পর তাতে কিছু গাদের মিশ্রণ থাকে। এমনিভাবে জগতের হর্তাকর্তাকে বিশ্বাস করাও সাধকদের একটি সুউচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু এতে কিছু না কিছু ভ্রূক্ষেপ গায়রুল্লাহর প্রতিও থেকে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কিছুই দেখে না, তার তুলনায় এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টি বহুত্বের দিকে থাকে।

এখানে প্রশ্ন হয়, মানুষ পৃথিবীতে এক সত্তা ছাড়া কিছুই প্রত্যক্ষ করবে না, তা কেমন করে সম্ভব? কেননা, সে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, তরুলতা ও অন্যান্য শরীরী বস্তুসমূহ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে। এসব বস্তু এক নয়— অনেক। অতএব, অনেক বস্তু এক কেমন করে হবে? এর জওয়াব এই, কোন কোন বস্তু কোন বিশেষ দৃষ্টিতে দেখলে অনেক হয়; কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে দেখলে একই হয়। উদাহরণতঃ মানুষকে যদি আমরা আত্মা, দেহ, হাত-পা, শিরা-উপশিরা, অস্থি ও অন্ত্রের দিক দিয়ে দেখি, তবে তাতে বহুত্ব থাকে; কিন্তু যদি অন্যদিক দিয়ে অর্থাৎ মানবতার দিক দিয়ে দেখি, তবে সে এক। অনেকেই মানুষকে দেখে এবং তাদের অন্তরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহুত্ব ও পৃথক হওয়া ধারণাও থাকে না। আসলে মানুষ যখন একত্বের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকে, তখন সে একের মধ্যে বিভেদ ও পার্থক্য দেখে না। আর যখন বহুত্বের দিকে লক্ষ্য করে, তখন এসব বস্তু যে আলাদা আলাদা, সেদিকে কল্পনা ধাবিত হয়। এমনিভাবে স্রষ্টা হোক কিংবা সৃষ্টি সকলকে দেখার আলাদা আলাদা ও বহু দৃষ্টিকোণ রয়েছে। কোন দৃষ্টিকোণে তারা এক এবং কোন দৃষ্টিকোণে অনেক। এখানে দৃষ্টান্তটি যদিও উদ্দেশ্যের সাথে পুরাপুরি খাপ খায় না, তবু এর মাধ্যমে মোটামুটিভাবে প্রত্যক্ষকরণে অনেক যে এক হতে পারে, তা বুঝা যায়।

সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর সত্তা ছাড়া অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর না হওয়ার অবস্থাটি কখনও সার্বক্ষণিক হয়ে থাকে, আবার কখনও বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। সত্য বলতে কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ীই হয়ে থাকে। এটা সর্বক্ষণ অব্যাহত থাকা খুবই বিরল। বর্ণিত আছে, হুসাইন ইবনে মনসূর হাল্লাজ ইবরাহীম খাওয়াসকে সফর করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি বর্তমানে কি কাজে মশগুল আছ? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ তাওয়াক্কুল পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে আজকাল আমি সফর করছি। হুমায়ুন ইবনে মনসূর বললেন ঃ তুমি অন্তর আবাদ করার কাজে সারা জীবন বিনষ্ট করেছ। ফানা ফিত্তাওহীদ (তাওহীদে বিলুপ্তি) কোথায় গেল? সেটা অবলম্বন কর না কেন? উদ্দেশ্য এই, হযরত খাওয়াস তৃতীয় স্তরের তাওহীদ পাকাপোক্ত করার কাজে মশগুল ছিলেন, আর হুমায়ুন তাঁকে চতুর্থ স্তর অবলম্বন করতে বলেছিলেন।

এ পর্যন্ত তাওহীদপন্থীদের মকামসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হল। এখন সেই তাওহীদের ব্যাখ্যা শোনা দরকার, যার উপর তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল। সে মতে চতুর্থ স্তরের তাওহীদ সম্পর্কে চিন্তাভাবনাই করা উচিত নয়। তাওয়াক্কুলও এর উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং তৃতীয় প্রকার তাওহীদ থেকেই তাওয়াক্কুলের হাল অর্জিত হয়। প্রথম প্রকার তাওহীদ হল নিফাক, যার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এর পাকাপোক্ত করার নিয়মপদ্ধতি কালাম শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। বেদআতীদের আপত্তিসমূহের জওয়াবও তাতে বর্ণিত হয়েছে। বাকী রইল তৃতীয় প্রকার তাওহীদ। বলা বাহুল্য, এর উপরই তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল। কেননা, কেবল বিশ্বাসগত তাওহীদই তাওয়াক্কুল সৃষ্টি করে না— এতে কিছু কাশফ ও প্রত্যক্ষণেরও দরকার। সুতরাং তৃতীয় প্রকার তাওহীদের ক্ষেত্রে যতটুকুর উপর তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল, নিম্নে আমরা ততটুকুই বর্ণনা করার প্রয়াস পাব।

সংক্ষেপে কথা হল, মানুষের কাছে এটা দিবালোকের ন্যায় প্রতিপন্ন হতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া জগতের সর্বময় কর্তা আর কেউ নেই। সৃষ্টি, রিযিক, বখশিশ, জীবন, মরণ, প্রাচুর্য, দরিদ্রতা ইত্যাদি যত বিষয়াদি রয়েছে, সবগুলোর স্রষ্টা, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। এতে কেউ তাঁর অংশীদার নেই। এ বিষয়টি যখন মানুষের কাছে প্রকটিত হয়ে যাবে, তখন সে অন্য কারও দিকে লক্ষ্য করবে না, অন্য কাউকে ভয় করবে না। তাঁরই কাছে আশা করবে এবং তাঁরই উপর ভরসা করবে। কেননা, সর্বাধিপতি তো কেবল তিনিই। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে, সবই তাঁর অধীন ও পদানত। মানুষের সামনে যখন কাশফের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন এটা সে চর্মচক্ষেও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়।

শয়তান মানুষকে এই তাওহীদ থেকে দু' উপায়ে বিরত রাখে এবং তার সাথে শিরক মিশ্রিত করে দেয়। প্রথমত, প্রাণিকুলের ক্ষমতার প্রতি

দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, জড় পদার্থের ক্ষমতার প্রতি মনোযোগের মাধ্যমে। জড়জগতের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হল এই, মানুষ শস্য উৎপাদনের জন্যে বৃষ্টির উপর ভরসা করে এবং বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে মেঘমালার উপর ভরসা করে। নৌকা পানির উপর সঠিকভাবে ভেসে থাকা এবং চলার ব্যাপারে অনুকূল বায়ুর উপর ভরসা। এ সমস্ত বিষয় তাওহীদের ক্ষেত্রে শিরক এবং আসল সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। এ কারণেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البراذا هم يشركون -

অর্থাৎ, তারা যখন নৌকায় আরোহণ করে, তখন একান্তভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে উদ্ধার করে ডাঙ্গায় পৌঁছে দেন, তখনই তারা শিরক করতে শুরু করে।

কতক তাফসীরকারের মতে এখানে শিরক করার অর্থ এই, তারা বলতে শুরু করে— যদি বায়ু অনুকূল না হতো, তবে আমরা তীরে পৌঁছুতে পারতাম না। কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত সে জানে, অনুকূল বাতাসও স্বেচ্ছায় চলে না যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাক তাকে চালান।

অতএব, নাজাতের ক্ষেত্রে বায়ুর প্রতি মানুষের মনোযোগ এমন, যেমন কোন প্রাণদণ্ডযোগ্য ব্যক্তি গ্রেফতার হয়, অতঃপর বাদশাহ তার মুক্তি ও ক্ষমার আদেশ লিখে দেন। এখন এই ব্যক্তি বাদশাহের দোয়াত, কলম ও কাগজকে স্মরণ করে বলে— যদি দোয়াত, কলম ও কাগজ না হত, তবে আমি রক্ষা পেতাম না। অর্থাৎ, সে কলম ইত্যাদিকেই নাজাতের কারণ মনে করে। যিনি কলম চালিয়েছেন, তাকে স্মরণ করে না। বলা বাহুল্য, এটা চূড়ান্ত মূর্খতা। যে ব্যক্তি জানে, কলম কোন আদেশ দিতে পারে না, বরং সে লেখকের অনুগত, সে কলমের দিকে মনোযোগ দিবে না এবং লেখক ছাড়া অন্য কোন কিছুর কাছে কৃতজ্ঞ হবে না। এমনকি, মুক্তির আনন্দ এবং বাদশাহের কৃতজ্ঞতায় কলম ও কালির কল্পনাও তার অন্তরে জাগ্রত হবে না। সুতরাং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, বৃষ্টি, মেঘমালা, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতি সমস্তই আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এমনিভাবে অনুগত, যেমন লেখকের হাতে কলম-কাগজ ইত্যাদি। এ দৃষ্টান্তটিও কেবল

বুঝানোর জন্যে, নতুবা দস্তখত বাদশাহ করলেও বাস্তবে লেখক আল্লাহ তা'আলাই। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

অর্থাৎ, আপনি যখন ধূলি নিক্ষেপ করলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।

মানুষের কাছে যখন প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার আদেশের অনুগত, তখন শয়তান তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যায় এবং তার তাওহীদে জড়পদার্থের অংশীদারিত্ব মিশ্রিত করতে পারে না। শয়তান তখন অন্য উপায় অবলম্বন করে। অর্থাৎ, প্রাণিকুলের ক্ষমতার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে এবং বলে— সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়— এ কথা তুমি কেমন করে বিশ্বাস করতে পারলে? দেখ, অমুক ব্যক্তি তার ক্ষমতা বলে তোমাকে রূযী-রোযগার দেয়। সে ইচ্ছা করলে তা বন্ধও করে দিতে পারে। বাদশাহ ইচ্ছা করলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারে। অতএব, বাদশাহকে ভয় করা উচিত এবং তাঁর কাছেই আশা করা উচিত। কেননা, তুমি তাঁর অধীন। শয়তানের এই প্ররোচনায় অনেক মানুষের পা পিছলে যায়। তবে আল্লাহ তা'আলার খাঁটি বান্দার উপর শয়তানের কোন প্রভাব নেই। তারা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে, লেখক অনুগত ও বাধ্য। কিন্তু যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য আল্লাহর নূর দ্বারা উন্মোচিত হয়নি, তার অন্তর্দৃষ্টি আকাশ ও পৃথিবীর মহাপ্রভুকে দেখতে অক্ষম। সে দেখে না যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ সবকিছুর উপর প্রবল। পক্ষান্তরে যারা "মোশাহাদা" তথা প্রত্যক্ষকরণের স্তরে উন্নীত, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নিজের কুদরত দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুকে বাকশক্তি সম্পন্ন করে দেন। এ সাধকগণ এসব অণু-পরমাণু আল্লাহর উদ্দেশে যে তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, তা নিজের কানে শুনে। অবশ্য তাদের কান এরূপ কান নয়, যা ধ্বনি ব্যতীত অন্য কিছু শুনতে পারে না। এরূপ কান তো গাধারও থাকে। অতএব, যে বস্তুতে চতুষ্পদ জন্তুও শরীক, তার তেমন মূল্য নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাওয়াক্কুলের ক্রিয়াকর্ম

তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। তাদের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু প্রত্যেকেই তাওয়াক্কুলের নিজ নিজ "মকাম" তথা অবস্থান লিপিবদ্ধ করেছেন। সূফী বুযুর্গদের এটাই রীতি। তাই সবগুলো বক্তব্য উদ্ধৃত করার মধ্যে কোন উপকার নেই দেখে আমরা এখানে বাস্তব বিষয়টি বর্ণনা করছি।

তাওয়াক্কুল শব্দটি "ওকালত" থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অপরের উপর ভরসা করে কাজ সমর্পণ করা। যাকে কাজ সমর্পণ করা হয়, তাকে উকিল এবং যে সোমর্পণ করে, তাকে "মোতাওয়াক্কেল" (মক্কেল) বলা হয়। এখন আমরা এর দৃষ্টান্তস্বরূপ মামলা-মোকদ্দমার উকিলের কথাই উল্লেখ করছি। যদি কোন ব্যক্তি অপরের কাছে মিছামিছি টাকা-পয়সা দাবী করে, তবে অপরপক্ষ বাদীর সাথে লড়াই করার জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করবে, যাতে সে বাদীর মিথ্যা দাবী ফাঁস করে দেয়। এমতাবস্থায় মক্কেল ততক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি আশ্বস্ত হবে না, যে পর্যন্ত সে উকিলের মধ্যে চারটি বিষয়ের বিশ্বাস না রাখবে। এক— চূড়ান্ত বিচক্ষণতা, দুই— সত্য প্রকাশে পূর্ণ সক্ষমতা। তিন— চূড়ান্ত বাকপটুতা এবং চার— মক্কেলের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি। বিচক্ষণতার কারণে উকিল ধোকা ও প্রবঞ্চনার স্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকবে। এমনকি, নাজুক ও সূক্ষ্ম কৌশলও তার অজানা থাকবে না। সক্ষমতার প্রয়োজন এজন্যে, যাতে সে সত্যকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে দেয়, বিচারকের সামনে ভীত না হয় এবং সত্য প্রকাশে লজ্জা ও কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় না দেয়। বাকপটুতাও এক প্রকার সক্ষমতা। কিন্তু এটা মুখের সক্ষমতা, যাতে মনের কথা উত্তমরূপে বর্ণনা করতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি ধোকার স্থান সম্পর্কে জ্ঞাত, তার জন্য জরুরী নয় যে, সে নিজের বাগ্মিতার দ্বারা তার সমাধান করে দিবে। পূর্ণ সহানুভূতির প্রয়োজন এজন্যে, যাতে উকিল মক্কেলের জন্যে যা কিছু করা সম্ভব, সবই করে। কেননা, মক্কেলের অবস্থার প্রতি সহানুভূতি ও মনোযোগ না থাকা পর্যন্ত কেবল মামলাবাজির ক্ষমতা যথেষ্ট হয় না। যদি উকিল এমন উদাসীন হয় যে, প্রতিপক্ষ মামলায় জিতলেও কোন দোষ নেই এবং মক্কেল জিতলেও কোন পরওয়া নেই, তবে তার প্রচেষ্টা যে কতটুকু সফল হবে, তা জানা কথা।

যদি মক্কেলের মনে উপরোক্ত চারটি বিষয় অথবা সেগুলোর কোন একটি বিষয়েও সন্দেহ থাকে, তবে সে উকিলের ব্যাপারে পুরোপুরি আশ্বস্ত হবে না। সে সর্বপ্রযত্নে উকিলের এসব ক্রটি দূর করতে সচেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে মক্কেল উকিলের এসব বৈশিষ্ট্যে যে পরিমাণ বিশ্বাস রাখবে, সে পরিমাণে তার উপর ভরসা ও প্রশান্ত হবে। বলা বাহুল্য, বিশ্বাস ও ধারণা শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য অপরিসীম। এ কারণেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারীদের অবস্থার বেলায়ও অনেক পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। এর সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস, যাতে কোন দুর্বলতা নেই। অর্থাৎ. মানুষের অন্তরে কাশফ অথবা দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে একথা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, সবকিছুর নিয়ন্তা আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। তিনি বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাদের জন্যে যথেষ্ট হওয়ার পূর্ণ সক্ষমতাও তাঁর আছে। প্রত্যেক বান্দার উপর তাঁর রহমত ও করুণাদৃষ্টি রয়েছে। তাঁর কুদরতের উপর কোন কুদরত নেই এবং তাঁর জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞান নেই। এরূপ বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করবে এবং অন্য কারও প্রতি মনোনিবেশ করবে না। কোন ব্যক্তি যদি নিজের ভেতরে এই বিশ্বাস না পায়, তবে এর কারণ দু'টি। এক— উপরোক্ত বিষয় চতুষ্টয়ের কোন একটি সম্পর্কে দুর্বল বিশ্বাসী হওয়া অথবা দুই— অন্তরে কাপুরুষতা ও কুসংস্কারের কারণে বক্রতা প্রবল হওয়া। কেননা, মাঝে মাঝে এমন হয় যে, বিশ্বাসে কোন ক্রটি না থাকলেও কুসংস্কারের আনুগত্য করার কারণে অন্তরে বক্রতা এসে যায়। উদাহরণতঃ যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বলা হয়, মৃত লাশের কাছে বিছানায় অথবা কক্ষে শুয়ে পড়, তবে সে তাতে সম্মত হবে না। যদিও সে নিশ্চিত রূপে জানে যে, এটা মৃত লাশ এবং চেতনা ও অনুভূতিহীন জড়পদার্থ। আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় জীবিত করবেন না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিশ্বাসে কোন সন্দেহ-সংশয় না আসা সত্ত্বেও সে মৃতের সাথে বিছানায় কিংবা বদ্ধকক্ষে একাকী থাকতে পছন্দ করে না। এটা মনের কাপুরুষতা ও এক প্রকার দুর্বলতা, যা থেকে কম মানুষই মুক্ত। মোটকথা, তাওয়াক্কুল পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য মন ও বিশ্বাস উভয়টিই শক্তিশালী হওয়া দরকার। এই উভয় প্রকার শক্তি দ্বারাই অন্তরে স্থিতি ও আশ্বস্ততা আসে। অন্তরের স্থিতি ভিন্ন বিষয় এবং বিশ্বাস ভিন্ন বিষয়। অনেক বিশ্বাস এমন থাকে, যার সাথে স্থিতি ও আশ্বস্ততার সম্পর্ক

নেই। যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—

قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ -

অর্থাৎ, আল্লাহ বললেন ঃ তুমি কি বিশ্বাস কর না? ইবরাহীম বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে আমার অন্তর আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে একথা বলেছি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি মৃতকে কিরূপে জীবিত করেন, তা আমাকে দেখান— যাতে বিষয়টি আমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ও স্থিতিশীল হয়ে যায়। মোটকথা, কাপুরুষতা ও কুসংস্কার মানুষের মজ্জার অন্তর্গত। এগুলোর কারণে বিশ্বাস উপকারী হয় না। জানা গেল যে, এটাও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী একটি বিষয়। যখন বিশ্বাস, আশ্বস্ততা ইত্যাদি সববিষয় অর্জিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা পূর্ণ হয়ে যায়। তাওরাতে লিখিত আছে— যে ব্যক্তি নিজের মতই কোন মানুষের উপর ভরসা করে, সে অভিশপ্ত। এক হাদীসে বর্ণিত আছে— যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সম্মান ও ইযযত কামনা করে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন।

তাওয়াক্কুলের অর্থ জানার পর এখন জানা দরকার যে, শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর আল্লাহ তা'আলার উপর এমন ভরসা করা, যেমন মক্কেল তার উকিলের উপর করে। এটা তাওয়াক্কুলের সর্বনিম্ন স্তর। দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ তা'আলার উপর এমন ভরসা করা, যেমন শিশু তার মায়ের উপর করে। সে মা ব্যতীত অন্য কাউকে চিনে না এবং তাকে ছাড়া অন্য কারও কাছে ফরিয়াদ করে না। মায়ের উপরই ভরসা করে। মাকে দেখলে তার আঁচল জড়িয়ে ধরে এবং ছাড়ে না। মায়ের অনুপস্থিতিতে কোন কষ্টের সম্মুখীন হলে সে প্রথমে মাকেই ডাকে এবং তার কথাই প্রথমে মনে আসে। কেননা, তার ঠিকানা মা পর্যন্তই সীমিত। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মধ্যেই মনোনিবেশ করে এবং লক্ষ্য ও আস্থা তাঁর প্রতিই নিবদ্ধ রাখে, সে আল্লাহর আশেক হবে, যেমন শিশু তার মায়ের আশেক হয়ে থাকে। এ স্তরের তাওয়াক্কুল প্রথম স্তরের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। উভয় স্তরের মধ্যে পার্থক্য এই, দ্বিতীয় স্তরের তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি নিজের তাওয়াক্কুল সম্পর্কেও বেখবর থাকে। অর্থাৎ, তার অন্তর তাওয়াক্কুলের প্রতি মনোযোগ

দেয় না; বরং যার উপর তাওয়াক্কুল, তার প্রতিই মনোযোগ রাখে। তার অন্তরে অন্য কোন কিছুর অবকাশ থাকে না। কিন্তু প্রথম স্তরের তাওয়াক্কুলকারী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ও উপার্জনের মাধ্যমে তাওয়াক্কুল করে। তাই সে নিজের তাওয়াক্কুল সম্পর্কে বেখবর থাকে না। এটা কেবল আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিপন্থী। হযরত সহল তস্তরীর উক্তিতে এই স্তরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ নিম্নতম তাওয়াক্কুল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আকাঙ্ক্ষা বর্জন করা। প্রশ্নকারী বলল ঃ মধ্যবর্তী স্তর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ এখতিয়ার ও অধিকার বর্জন করা। এতে দ্বিতীয় স্তরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রশ্নকারী সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে শুধু বললেন ঃ এটা সে'ই জানে, যে মধ্যবর্তী স্তরে পৌঁছে যায়।

তাওয়াক্কুলের তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আল্লাহর হাতে তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তির নিজের গতিবিধিতে এমন হওয়া, যেমন মৃত ব্যক্তি গোসলদাতার হাতে থাকে। অর্থাৎ, নিজেকে মৃত মনে করা, যাকে কেবল খোদায়ী কুদরতই গতিশীল করে থাকে। যেমন গোসলদাতার হাত মৃতকে গতিশীল করে। এরূপ তাওয়াক্কুলকারীর সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকে, গতিশীলতা, ইচ্ছা, জ্ঞান ও অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলী আল্লাহ তা'আলাই জারি করেন। এ ধরনের লোক তার সাথে কি ঘটনা ঘটবে সে অপেক্ষায় থাকবে। সে শিশু থেকে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র হবে যে, শিশু মায়ের কাছে আবদার করে এবং তার আঁচল জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে তা করবে না; বরং সে এমন শিশুর মত, যে মনে করে, মায়ের কাছে আবদার না করলে মা তাকে খুঁজবে, তাকে জড়িয়ে না ধরলে সে নিজেই বুকে টেনে নেবে এবং তার কাছে দুধ না চাইলে সে নিজেই দুধ পান করাবে। এই স্তরের তাওয়াক্কুলকারী আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও দানে ভরসা করে সওয়াল ও দোয়া বর্জন করে এবং মনে করে, তিনি সওয়াল ছাড়াই সওয়ালের চেয়ে উত্তম দান করবেন। কেননা, তিনি সওয়াল ও দোয়ার পূর্বেই অনেক নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন। এ ধরনের তাওয়াক্কুলের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়; কিন্তু খুবই বিরল। মুখমন্ডলে ভয়জনিত পাণ্ডুরতা যেমন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে, এই তাওয়াক্কুলও তেমনি আসা-যাওয়া করতে থাকে। কেননা, নিজের গতি ও কুদরতকে ব্যবহার করা এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার এবং এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা একটি সাময়িক ব্যাপার। দ্বিতীয় স্তরের

তাওয়াক্কুলের স্থায়িত্ব জ্বরাক্রান্ত রোগীর পাণ্ডুরতার ন্যায়, যা কখনও দু'চার দিন থেকে যায়। প্রথম স্তরের স্থায়িত্ব সেই রোগীর পাণ্ডুরতার মত, যার রোগ স্থায়ী হয়ে গেছে। এই পাণ্ডুরতা সর্বক্ষণ থাকাও কঠিন নয় এবং বিলীন হয়ে যাওয়াও অবান্তর নয়।

তাওয়াক্কুলের এ সকল স্তরে বাহ্যিক উপায়াদির সাথে তাওয়াক্কুলকারীর কোন সম্পর্ক থাকে কি না, এ প্রশ্নের জওয়াব এই, তৃতীয় স্তরে কোন সম্পর্কই থাকে না। এই স্তরে তাওয়াক্কুলকারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তিদের মত থাকে। দ্বিতীয় স্তরে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া ও সওয়াল করা ছাড়া অন্য কোন তদবীর থাকে না। প্রথম স্তরে তদবীর ও এখতিয়ার কোন কিছুই বিলুপ্ত হয় না। তবে কতক তদবীর বিলুপ্ত হয়। যেমন, মক্কেল তার উকিলের উপর ভরসা করে কতক তদবীর বর্জন করে। কিন্তু উকিল যে তদবীর করতে বলে তা বর্জন করে না। উদাহরণতঃ উকিল যদি বলে যে, আপনি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত থাকলে আমি কথা বলার জন্যে মুখ খুলব, তবে মক্কেল আদালতে উপস্থিতি বর্জন করে না। এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ, এর অর্থ এই হয় না যে, সে উকিলকে ত্যাগ করে শুধু নিজের চেষ্টা-তদবীরের উপর ভরসা করেছে। বরং এটা তাওয়াক্কুলের পরিপূরক বিষয়। কেননা, উকিল তার জন্যে উপযুক্ত বিবেচনা করে যা বলেছে, সে তাই করেছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ সত্যিকারভাবে অনুধাবন করলে তাওয়াক্কুল সম্পর্কিত অনেক আপত্তি দূরীভূত হয়ে যায় এবং বুঝা যায় যে, যাবতীয় তদবীর বর্জন করা এবং সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত নয়। বরং তাওয়াক্কুলে কতক তদবীর বর্জন করা জায়েয এবং কতক তদবীর বর্জন করা নাজায়েয। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে উল্লিখিত হবে।

তাওয়াক্কুল ও মাশায়েল ঃ এখানে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে বুযুর্গদের কিছু কিছু উক্তি উল্লেখ করা হবে, যাতে জানা যায়, এ সম্পর্কে তারা যা কিছু বলেছেন, তা সমস্তই আমাদের বর্ণিত তাওয়াক্কুলের তিন স্তরের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেক উক্তির মধ্যে কতক অবস্থার প্রতি ইশারা আছে।

আবু মূসা বলেন ঃ আমি আবু এয়াযীদ বুস্তামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাওয়াক্কুল কি? তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? আমি বললাম ঃ আমাদের সঙ্গী বলেন, যদি সাপ ও বিচ্ছু কোন ব্যক্তিকে ডান ও

বাম দিক থেকে ঘিরে ফেলে, তবে তার অন্তরে কোনরূপ নড়চড় না হওয়া চাই। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাওয়াক্কুল এরই কাছাকাছি। কিন্তু যদি জান্নাতীরা জান্নাতে সুখভোগ করে এবং দোযখীরা দোযখে আযাব ভোগ করে, তবে তাওয়াক্কুলকারী তাদের মধ্যে পার্থক্য করলে সে সম্পূর্ণই তাওয়াক্কুলের সীমার বাইরে চলে যাবে। এখানে হযরত আবু মূসার উক্তিতে তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ, তৃতীয় স্তর বর্ণিত হয়েছে। আর আবু এয়াযীদের বক্তব্যে উত্তম প্রকার অর্থাৎ, খোদায়ী হেকমত ও প্রজ্ঞা বিধৃত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করেছেন, তাই হওয়া উচিত। ইনসাফ ও প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ বিষয়টি অত্যধিক গভীর। হযরত আবু এয়াযীদ এ ধরনের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বলতেন না।

তাওয়াক্কুলের প্রথম স্তরে সাপ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করার শর্ত নেই। কেননা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হেরা গুহায় অবস্থানকালে সাপের গর্তসমূহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটা তাওয়াক্কুল বিরোধী হলে তিনি তা করতেন না।

হযরত যুন্নুন মিসরীকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য প্রতিপালক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং 'আসবাব' তথা উপায়াদির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার নাম তাওয়াক্কুল। এখানে অন্যান্য প্রতিপালক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বলে তিনি তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং উপায়াদির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কথা বলে তাওয়াক্কুলের করণীয় বিষয়ের প্রতি ইশারা করেছেন।

হামদুন গাযর তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ যদি কারও কাছে দশ হাজার দেরহাম থাকে এবং এক দেরহাম ঋণ থাকে, তবে এ আশংকা থেকে মুক্ত না থাকা যে, ঋণ ঘাড়ে রেখেই সে মারা যাবে। পক্ষান্তরে যদি কারও যিম্মায় দশ হাজার দেরহাম ঋণ থাকে এবং তা শোধ করার জন্যে কোন কিছুই না থাকে, তবু এ বিষয়ে নিরাশ না হওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা এই ঋণ শোধ করে দিবেন। এ উক্তিতে কেবল আল্লাহর বিস্তৃত কুদরতে বিশ্বাস করা এবং কুদরতের জন্যে বাহ্যিক উপায়াদি ছাড়া গোপন উপায়াদিও রয়েছে একথা মেনে নেয়াকে তাওয়াক্কুল বলা হয়েছে।

হযরত আবু ওবায়দুল্লাহ কারশীকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার নাম

তাওয়াক্কুল। প্রশ্নকারী বলল ঃ আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ যে উপায় অন্য উপায়ের দিকে পৌঁছে, তা বর্জন করা এবং কেবল আল্লাহ্ তা'আলাকেই কার্যনির্বাহী মনে করা। এখানে প্রথম বাক্যে তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তরই শামিল এবং দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষভাবে তৃতীয় স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এটা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তাওয়াক্কুলের অনুরূপ। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় হযরত জিবরাঈল তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়। কেননা, জিবরাঈলের প্রশ্ন তাঁর হেফাযতের একটি উপায় ছিল, যা অন্য উপায়ের দিকে পৌঁছত। হযরত ইবরাহীম এটা এই ভরসায় বর্জন করলেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি জিবরাঈলকে হেফাযত করতে বাধ্য করে দিবেন। এমতাবস্থায় এ কাজের কার্যনির্বাহী তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ) হবেন।

হযরত আবু সাঈদ খারায বলেন ঃ দু'টি বিষয়ের নাম তাওয়াক্কুল— স্থিতিহীন চাঞ্চল্য এবং চাঞ্চল্যহীন স্থিতি। এতে তিনি সম্ভবত দ্বিতীয় স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, চাঞ্চল্যহীন স্থিতির মানে এই যে, উকিলের প্রতি অন্তর দ্বিধাহীনভাবে স্থিতিশীল হবে। পক্ষান্তরে স্থিতিহীন চাঞ্চল্য বলে বুঝানো হয়েছে, কাকুতি-মিনতি ও ফরিয়াদ আল্লাহর সামনে হবে; যেমন শিশু আপন দেহ দিয়ে মায়ের দিকে চঞ্চল থাকে।

তাওয়াক্কুলকারীদের ক্রিয়াকর্ম ঃ কেউ কেউ মনে করে, তাওয়াক্কুল হচ্ছে দেহ ও মন সহযোগে কোন কাজকর্ম ও কৌশল-চিন্তা না করা এবং ছিন্নবস্ত্র অথবা মাংসপিণ্ডের ন্যায় মাটিতে পড়ে থাকা। এটা মূর্খদের ধারণা, যা শরীয়তের আইন অনুযায়ী হারাম। শরীয়তে তাওয়াক্কুলকারীদের প্রশংসা বর্ণিত আছে। এমতাবস্থায় একটি হারাম কাজ করে কিরূপে প্রশংসনীয় স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব? তাই আমরা এখানে বাস্তব ও সুচিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

মানুষের ইচ্ছাধীন চেষ্টা-চরিত্র চারটি উদ্দেশ্যের জন্যে হয়ে থাকে। এক— কোন উপকারী বস্তু অর্জন করা, যা তার কাছে নেই। যেমন, ধন উপার্জন করা। দুই— নিজের উপকারী বস্তুসমূহ সংরক্ষণ করা। যেমন, ধন সঞ্চয় করা। তিন— কোন উৎপীড়নকারীকে উৎপীড়নের পূর্বেই প্রতিহত করা। উদাহরণতঃ হিংস্র জন্তু অথবা চোর-ডাকাতের উপদ্রব দূর করা। চার— যে বিপদ উপরে এসে গেছে, তা দূর করার চেষ্টা করা। যেমন, রোগের চিকিৎসা করা ইত্যাদি। মানুষের চেষ্টা-চরিত্র এই চারটি উদ্দেশ্যের

বাইরে নয়। আমরা এই চার প্রকার ক্রিয়াকর্মে তাওয়াক্কুলের শর্ত ও স্তর প্রমাণসহ চারটি ভাগে বর্ণনা করার প্রয়াস পাব।

(১) যে সকল উপায়ে মানুষ উপকারী বস্তু অর্জন করতে পারে, সেগুলো তিন প্রকার। এক— নিশ্চিত উপায়। অর্থাৎ, সদাসর্বদা যা একইভাবে হয়— এর খেলাফ হয় না। উদাহরণতঃ ক্ষুধা দূর করার জন্যে হাত বাড়িয়ে খাদ্য মুখে দেয়া, চিবানো এবং গলাধঃকরণ করা। এখন কেউ যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় সামনে রাখা খাদ্যের দিকে হাত না বাড়ায় এবং বলে ঃ আমি তো তাওয়াক্কুল করেছি, আর তাওয়াক্কুলের শর্ত হচ্ছে— কোন কাজ না করা। হাত বাড়ানো, দাঁতে চিবানো এবং গলাধঃকরণ করা কাজ বৈ নয়। তাই আমি এগুলো করব না। এ ধরনের কথাবার্তা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং একে বলা হবে পাগলামি। কেননা, ক্ষুধা দূর করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এসব ক্রিয়াকর্মকে অকাট্য উপায় হিসাবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। কখনও এর বিপরীত হয় না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি অপেক্ষায় থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই তার উদরপূর্তি করে দেবেন অথবা খাদ্যকে গতিশীল করে দেবেন, ফলে সে আপনা-আপনি মুখে চলে আসবে অথবা কোন ফেরেশতাকে আদেশ করবেন, সে খাদ্য চিবিয়ে পাকস্থলীতে রেখে যাবে, তবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রবর্তিত রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে বিবেচিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কর্ম বর্জনের নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং তাওয়াক্কুলে এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা খাদ্য গ্রহণের জন্যে হাত, দাঁত, শক্তি ও নড়াচড়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং খাদ্য ও পানীয় দেয়া তাঁরই কাজ। তবে হাত ও খাদ্যের উপরই মনে স্বস্তি ও ভরসা না থাকা উচিত। বাস্তবেও হাতের উপর ভরসা করা যায় না। কেননা, মাঝে মাঝে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাত অবশ হয়ে যায়। শক্তির উপরও ভরসা করা যায় না। কারণ, মানুষ প্রায়ই এমন আঘাতের সম্মুখীন হয়, যার ফলে তার বুদ্ধি-জ্ঞান ও নড়াচড়ার শক্তি রহিত হয়ে যায়। এমনিভাবে খাদ্য বিদ্যমান থাকার উপরও ভরসা করা যায় না। কেননা, মাঝে মাঝে কোন শক্তিধর এসে তা ছিনিয়ে নিয়ে যায় অথবা কোন সাপ এসে যায়, যার কারণে মানুষকে খাদ্য রেখেই পালাতে হয়। মোটকথা, এগুলোর মধ্যে এ ধরনের বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে এবং এর প্রতিকার আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ছাড়া কিছুতেই হয় না। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর উপরই ভরসা করা।

দ্বিতীয় প্রকার উপায় নিশ্চিত নয়; কিন্তু প্রায়শ এই উপায় ছাড়া উদ্দেশ সিদ্ধ হয় না কিংবা সিদ্ধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি শহর ও কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাথেয় সঙ্গে না নিয়ে এমন জঙ্গলে সফর করে, যেখানে মানুষের যাতায়াত খুবই বিরল। এরূপ সফরে পাথেয় না নেয়া তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়। বরং জঙ্গলের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়া পূর্ববর্তীদের রীতি ও সুন্নত। এতে তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি হয় না। তবে ভরসা আল্লাহর অনুগ্রহের উপর থাকা কর্তব্য— পাথেয়ের উপর নয়। কিন্তু যদি কেউ পাথেয় সঙ্গে না নেয়, তবে তাও জায়েয এবং তা অনেক উচ্চস্তরের তাওয়াক্কুল। কেননা, বিশিষ্ট বুযুর্গদের এটাই ছিল রীতি। প্রশ্ন হয়, পাথেয় সঙ্গে না নেয়ার অর্থ নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া, যা শরীয়তে হারাম। এর জওয়াব এই, এটা দু' কারণে হারামের বাইরে থাকতে পারে। এক, কোন ব্যক্তি সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে এক সপ্তাহ অথবা কমবেশী সময় ক্ষুধার্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। এ সময়ে সে মনের সংকীর্ণতা, অস্থিরতা ও কঠিনতা ছাড়াই আল্লাহর যিকুর করতে সক্ষম হয়। দুই, ঘাস ও লতাপাতা ইত্যাদি খেয়েও মানুষ কিছুদিন জীবিত থাকতে পারে। তবে এতে মুজাহাদার দরকার হবে। মুজাহাদা তাওয়াক্কুলের মূল। বিশিষ্ট বুযুর্গগণ এর উপরই ভরসা করতেন। তারা এ ধরনের সফরে সুঁই, কাঁচি, রশি ও ছোট বালতি অবশ্যই সঙ্গে রাখতেন এবং বলতেন ঃ এতে তাওয়াক্কুলের ত্রুটি হয় না। কারণ, তারা জানতেন, জঙ্গলে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্যে রশি ও বালতি ছাড়া পানি উপরে উঠে আসে না। এটা আল্লাহ তা'আলার রীতি নয়। জঙ্গলে অধিকাংশ সময় বালতি ও রশি পাওয়া যায় না। ঘাস, শাক-পাতা ইত্যাদি অনেক পাওয়া যায়। সফরে প্রত্যহ কয়েকবার উযু করার জন্যে এবং পান করার জন্যে পানির প্রয়োজন পড়ে। এমনিভাবে তাদের কাছে একটিমাত্র বস্ত্র থাকত। এটা ছিঁড়ে গেলে সুঁই-সুতা কোথাও পাওয়া যায় না। সুঁই-সুতার বিকল্পও জঙ্গলে কোন কিছু থাকে না। সুতরাং তাওয়াক্কুলের কারণে জঙ্গলে সফর করার সময় এসব প্রয়োজনীয় বস্তু বর্জন করা জায়েয হবে না। যদি কোন ব্যক্তি পাহাড়ের কোন উপত্যকায় তাওয়াক্কুল করার জন্যে যায়, তবে সে গোনাহ্গার হবে এবং নিজেই নিজের প্রাণ বধ করবে। বর্ণিত আছে— জনৈক দরবেশ লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন পাহাড়ের পাদদেশে সাত দিন অবস্থান করল। সে বলল ঃ আমি কারও কাছে কিছু চাইব না, যে পর্যন্ত আল্লাহ

আমাকে আমার রিযিক পৌঁছে না দেন। সাত দিন বসে থাকার পর সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেল; কিন্তু রিযিক এল না। সে আল্লাহর দরবারে মিনতি করে বলল ঃ ইলাহী! যদি তুমি আমাকে জীবিত রাখতে চাও, তবে আমার জন্যে যে রিযিক লিখে দিয়েছ, তা আমাকে দান কর। নতুবা আমার রূহ কবজ করে নাও। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হল ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, যতদিন তুমি লোকালয়ে গিয়ে মানুষের মধ্যে না বসবে, তোমাকে রিযিক দেব না। দরবেশ লোকালয়ে চলে গেল। কেউ তার কাছে খাদ্য নিয়ে এল এবং কেউ পানি নিয়ে এল। কিছু পানাহার করে যখন সে কিছুটা সুস্থ হল, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বলা হল ঃ তুমি দুনিয়াতে দরবেশী করে আমার প্রজ্ঞাময় নীতি বিনষ্ট করতে চাও। তুমি কি জান না যে, আমি আমার বান্দাদেরকে নিজের কুদরতের হাতে রিযিক পৌঁছানোর তুলনায় অন্য মানুষের হাত দিয়ে রিযিক পৌঁছানোকে অধিক ভাল মনে করি? এ থেকে জানা গেল, যাবতীয় উপায়াদি থেকে দূরে থাকা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞানীতির বিরোধী এবং আল্লাহর রীতি ও অভ্যাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী কাজ করলে অর্থাৎ, তাওয়াক্কুল উপায়াদির উপর না করে আল্লাহর উপর করলে তা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়। তবে উপায়াদি দু'প্রকার— বাহ্যিক ও গোপনীয়। তাওয়াক্কুলকারীর উচিত, বাহ্যিক উপায়াদি থেকে মুখ ফিরিয়ে গোপন উপায়াদি অবলম্বন করা।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, জীবিকার জন্যে কোন পেশা অবলম্বন না করে লোকালয়ে অবস্থান করা কিরূপ? এটা হারাম, মোবাহ, না মোস্তাহাব? জওয়াব এই যে, এটা হারাম নয়। কেননা, পাথেয় ছাড়া জঙ্গলে সফরকারী ব্যক্তি যখন আত্মহন্তা সাব্যস্ত হল না, তখন লোকালয়ে বসবাসকারী কিছুতেই নিজেকে বিনাশকারী হতে পারে না। এখানে সে ধারণাতীত জায়গা থেকে খাদ্যপ্রাপ্ত হতে পারে, তবে তা পেতে কখনও বিলম্ব হতে পারে, যাতে সবর করা সম্ভব। তবে ঘরের দরজা এমনভাবে বন্ধ করে বসা, যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে— এটা হারাম। কিন্তু যদি ঘরের দরজা খোলা রেখে আল্লাহর এবাদতে মশগুল না থাকে— বেকার বসে থাকে, তবে এটা হারাম না হলেও অনাহারে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে। তখন জীবিকা উপার্জনের জন্যে বের হওয়া অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে আন্তরিকভাবে এবাদতে মশগুল থাকলে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের উপর

নির্ভর করে কে আসে, কে যায় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করলে তা অবশ্যই তাওয়াক্কুলের অন্যতম মকাম। এরূপ ক্ষেত্রে জনৈক আলেম বলেন— বান্দা রিযিক থেকে পলায়ন করলে রিযিক তাকে তালাশ করবে, যেমন কেউ মৃত্যু থেকে পলায়ন করলে মৃত্যু তাকে খুঁজে বের করে ছাড়ে। এটাও এই আলেমেরই উক্তি যে, মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করে— ইলাহী! আমাকে রূযী দিয়ো না, তবে এ দোয়া কবুল হবে না এবং দোয়াকারী গোনাহগার হবে। আল্লাহ বলবেন ঃ ওহে মূর্খ! এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমি তোমাকে সৃষ্টি করব, আর রূযী দেব না? এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ প্রত্যেক বিষয়েই মতভেদ করে; কিন্তু রিযিক ও মৃত্যুর ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন রিযিকদাতা ও মৃত্যুদাতা নেই। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

لو توكلتمّ على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير

تغد وخماصا وتروح بطانا ولزالت بدعائكم الجبال -

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথার্থ তাওয়াক্কুল করতে, তবে তিনি পক্ষীকুলের ন্যায় তোমাদেরকে রিযিক দিতেন। পক্ষীকুল সকালে ক্ষুধার্ত বের হয়ে যায় এবং বিকালে উদরপূর্তি অবস্থায় নীড়ে ফিরে আসে। এছাড়া তোমাদের দোয়ায় পাহাড় পর্যন্ত টলে যেত।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ পাখীদের দেখ, তারা ফসল উৎপন্ন করে না এবং খাদ্য সঞ্চয় করে না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অব্যাহতভাবে প্রত্যহ রিযিক দান করেন। যদি তোমরা বল, আমাদের পেট বড়, তবে চতুষ্পদ জন্তুদের প্রতি তাকাও— আল্লাহ তা'আলা তাদের রিযিকের জন্যে মানুষকে কিভাবে নিয়োজিত করেছেন।

আবু এয়াকুব যুসী বলেন ঃ তাওয়াক্কুলকারীদের রিযিক তাঁদের শ্রম ছাড়াই মানুষের হাতে চালু থাকে এবং অবশেষে তারা বিনা দ্বিধায় পেয়ে যায়। অন্যরা দিবারাত্রি রিযিকের চিন্তায় মশগুল থাকে এবং কষ্ট স্বীকার করে।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বান্দাকে রিযিক

দেন; কিন্তু কেউ কেউ অপমান সহকারে তা পায়। যেমন, ভিক্ষাবৃত্তি করে এবং কেউ কেউ পরিশ্রম ও অপেক্ষা করে পায়। যেমন, ব্যবসায়ী। আবার কেউ কেউ প্রাণান্ত চেষ্টা-চরিত্র করে; যেমন, কারিগর এবং কেউ কেউ ইযযত ও সম্মান সহকারে; যেমন সূফী বুযুর্গগণ।

তৃতীয় প্রকার উপায় এমন, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া সন্দিগ্ধ ব্যাপার। যেমন, ধন উপার্জনে সূক্ষ্ম কলাকৌশল অবলম্বন করা। মানুষ এক্ষেত্রে যে সব কলা-কৌশল অবলম্বন করে, তাতে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া জরুরী নয়। এ ধরনের উপায় অবলম্বন করলে তাওয়াক্কুল সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ মানুষ এতেই লিপ্ত রয়েছে। তারা বৈধ ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্যে অনেক সূক্ষ্ম কলাকৌশল বের করতে থাকে। অবৈধ ধন অর্জনে কলাকৌশল প্রয়োগ করার ফলে যে তাওয়াক্কুল বাতিল হয়ে যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রকার উপায়াদির সংখ্যা এত বেশী যে, গণনা করা সম্ভবপর নয়। হযরত সহল বলেন ঃ কলাকৌশল বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ও নিজের মধ্যে আড়াল রাখেননি। মানুষের কলাকৌশলই মানুষের আড়াল। চিন্তাভাবনা করে দূরবর্তী উপায়সমূহ বের করাই সম্ভবত এখানে হযরত সহলের উদ্দেশ্য। কেননা, এ জাতীয় উপায়ের মধ্যেই কলাকৌশল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, কোন কোন উপায়াদি অবলম্বন করার ফলে মানুষ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয়ে যায় এবং কোন কোন উপায়াদি অবলম্বনের ফলে তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না। দ্বিতীয় প্রকার উপায়াদির মধ্যে কতক এমন যে, সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া সুনিশ্চিত এবং কতক এমন, যা সন্দিগ্ধ তথা নিশ্চিত নয়। সুনিশ্চিত উপায়াদি অবলম্বন করলে কেউ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না— যদি ভরসা কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর হয় এবং উপায়াদির উপর না হয়। সন্দিগ্ধ উপায়াদি অবলম্বন করলেও মানুষ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না— যদি মনের শান্তি আপন শক্তি ও পুঁজির সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়। এই ধরনের উপায়াদি বর্জন করে যারা তাওয়াক্কুল করে, তা তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথম, বিশিষ্ট বুযুর্গগণের স্তর, যারা পাথেয় সঙ্গে না নিয়েই নির্জন জঙ্গলে সফর করেন এবং আল্লাহ তা'আলার কৃপার উপর আস্থা রাখেন যে, তিনি

এক সপ্তাহ কিংবা আরও সময় পর্যন্ত সবর করার শক্তি দেবেন অথবা বেঁচে থাকার জন্যে শাক, লতাপাতা ইত্যাদি পাওয়া যাবে। যদি কিছু পাওয়া না যায়, তবে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতেও দ্বিধা নেই। কেননা, যাদের কাছে পাথেয় থাকে, তারাও মাঝে মাঝে অনাহারে মারা যায়। কারণ, তাদের পাথেয় বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা জঙ্গলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যুর মুখে চলে যায়। পাথেয় থাকা এবং না থাকা উভয় অবস্থাতেই যখন মৃত্যু হতে পারে, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের উপর ভরসা করাই উত্তম।

দ্বিতীয় স্তর এমন তাওয়াক্কুলকারীদের, যারা নিজ গৃহে অথবা মসজিদে বসে থাকে। এই স্তরে অবস্থানকারী প্রথম স্তর থেকে কম হলেও তাকে তাওয়াক্কুলকারীই বলতে হবে। কারণ, সে উপার্জন ও বাহ্যিক উপায়াদি বর্জন করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর ভরসা করে এবং মনে করে তিনি গোপন উপায়াদির মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করে দেবেন। অবশ্য শহরে থাকাও রিযিক লাভের অন্যতম উপায়। কিন্তু এতে তার তাওয়াক্কুল বাতিল হবে না যদি লক্ষ্য কেবল সেই আল্লাহর উপর থাকে, যিনি শহরবাসীদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং শহরবাসীদের উপর লক্ষ্য না থাকে।

তৃতীয় স্তর এমন তাওয়াক্কুলকারীদের, যারা চলাফেরার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করে। তবে উপার্জন করলেও কেউ তাওয়াক্কুলের মকাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। তবে এ জন্যে শর্ত এই যে, মনের স্বস্তি আপন পুঁজি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থের উপর নির্ভরশীল না হওয়া চাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারেন। বরং আল্লাহ তা'আলার কৃপার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। এই উপার্জনকারী ব্যক্তি যদি আপন পরিবারবর্গের জন্যে অথবা ফকীর-মিসকীনকে দান করার জন্যে উপার্জন করে, তবে সে বাহ্যতঃ উপার্জনকারী এবং আন্তরিকভাবে উপার্জন থেকে আলাদা গণ্য হবে এবং সে গৃহে উপবেশনকারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ তাওয়াক্কুলকারী বিবেচিত হবে।

শর্তসহ উপার্জন যে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, তার প্রমাণ এই যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলীফা মনোনীত হন, তখন কাপড়ের পুঁটলি বগলে দাবিয়ে বাজারে চলে যান। মুসলমানদের কাছে ব্যাপারটি খারাপ মনে হলে তারা আরয করল ঃ আপনি এরূপ করেন কেন? এখন তো আপনি পয়গাম্বর (সাঃ)-এর খলীফা। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি আমার পরিবারবর্গের জন্যে উপার্জন না করলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি নিজের

পরিবারকেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারি, তবে মুসলমানদেরকে রক্ষা করব কিরূপে? অতঃপর খলীফাকে ভাবনামুক্ত করার জন্যে মুসলমানরা তাঁর জন্যে একটি সাধারণ মুসলিম পরিবারের অনুরূপ ভাতা নির্ধারিত করে দেয়। তিনি যখন এর মধ্যেই মুসলমানদের মর্জি ও সন্তুষ্টি দেখতে পেলেন, তখন তাদের কাজেই তিনি নিজের অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে শুরু করলেন।

এখন একথা বলা অসম্ভব যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাওয়াক্কুলের মকামে ছিলেন না। তাঁর চেয়ে বেশী তাওয়াক্কুলকারী আর কে ছিল? তিনি নিশ্চিতই তাওয়াক্কুলকারী ছিলেন। তবে তাঁর তাওয়াক্কুল উপার্জন ও চেষ্টা-তদবীর না করার দিক দিয়ে ছিল না; বরং নিজের শক্তি-সামর্থের উপর ভরসা না করার দিক দিয়ে ছিল। তিনি আল্লাহ তা'আলাকেই জীবিকা সরবরাহকারী এবং উপায়াদির নিয়ন্ত্রক জ্ঞান করতেন। উপার্জনের পথে যে সকল শর্ত ছিল, সেগুলো তিনি পালন করতেন। অর্থাৎ, যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু উপার্জন করেই বিরত থাকতেন। অনেক উপার্জনের বাসনা করতেন না এবং সঞ্চয়ের লালসা করতেন না।

সংসারের প্রতি অনাসক্তি ছাড়া তাওয়াক্কুল ঠিক হয় না। হ্যাঁ, সংসার অনাসক্তি তাওয়াক্কুল ছাড়াও হতে পারে। কেননা, তাওয়াক্কুলের মকাম সংসার অনাসক্তির পরে। হযরত জুনায়দের পীর আবু জা'ফর হাদ্দাদ (রহঃ) বলেন ঃ আমি বিশ বছর পর্যন্ত তাওয়াক্কুলকে গোপন রেখেছি এবং বাজার থেকে আলাদা হইনি। আমি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে এক দীনার উপার্জন করতাম; কিন্তু রাতের জন্যে একটি কানাকড়িও রাখতাম না। নিজের সুখের জন্যও তা থেকে কিছু ব্যয় করতাম না। হযরত জুনায়দ পীরের সামনে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে কোন আলোচনা করতেন না এবং বলতেন ঃ আপনি তাওয়াক্কুলের মকামে আছেন। তাই এ সম্পর্কে কিছু বলতে আমি লজ্জাবোধ করি।

মানুষের হাত গুটিয়ে বসে থাকা উত্তম, না চলাফেরা করে কিছু উপার্জন করা উত্তম? এ প্রশ্নের জওয়াব এই, যদি উপার্জন ত্যাগ করলে যিকর, ফিকর ও এবাদতে সমস্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ পাওয়া যায়, মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার লোভ না হয়; বরং সবর ও আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করার ব্যাপারে অন্তর মযবুত থাকে, তবে ঘরে

বসে থাকাই উত্তম। আর যদি ঘরে বসে থাকলে মন চঞ্চল হয় এবং মানুষের দিকে দৃষ্টি থাকে, তবে কাজ-কর্ম করে উপার্জন করা উত্তম। কেননা, অন্তর দিয়ে মানুষের অপেক্ষা করা যেন অন্তর দিয়ে সওয়াল করা। এটা বর্জন করা কাজ-কর্ম বর্জন করার চেয়ে অধিক জরুরী। পূর্ববর্তী তাওয়াক্কুলকারীগণের রীতি ছিল যে, তারা মন যে বস্তুর লালসা করত, তা গ্রহণ করতেন না। সে মতে হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একবার আবু বকর মরুযীকে বললেন ঃ অমুক ফকীরকে সাধারণ মজুরির চেয়ে বেশী দেবেন। তিনি বেশী মজুরি দিলে ফকীর তা ফিরিয়ে দিল এবং সেখান থেকে প্রস্থান করল। ইমাম আহমদ বললেন ঃ এখন গিয়ে তাকে দিয়ে দিন। সে গ্রহণ করবে। আবু বকর মরুযী গেলেন এবং মজুরি পেশ করতেই ফকীর তা গ্রহণ করল। অতঃপর ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, ফকীর এখানে তা গ্রহণ করল না, সেখানে তা গ্রহণ করল, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ প্রথমে তার মনে বেশী পাওয়ার লালসা ছিল। তাই গ্রহণ করেনি। এখান থেকে প্রস্থান করার পর তার মন নিরাশ হয়ে গেল। তাই সে গ্রহণ করল।

মোটকথা, তাওয়াক্কুলকারী যখন বেশী পাওয়ার লোভ না করবে এবং নিজের শক্তি-সামর্থ ও পুঁজির উপর ভরসা না করবে, তখন সে প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী হবে। পুঁজির উপর ভরসা না করার আলামত এই যে, যদি ধন-সম্পদ চুরি হয়ে যায় অথবা ব্যবসায়ে লোকসান হয়ে যায়, তবে তাতেও সন্তুষ্ট থাকবে, মনের স্বস্তি বিনষ্ট হবে না এবং অন্তরে কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখা দেবে না। কেননা, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, মন যে বস্তুর সাথে জড়িয়ে না পড়ে, তা বিনষ্ট হয়ে গেলে মন চঞ্চল ও বিচলিত হয় না। এখন প্রশ্ন হয়, পুঁজি ছাড়া উপার্জন হয় না— একথা জানার পর পুঁজির সাথে অন্তর জড়িত না হওয়া কিরূপে সম্ভব? এর উত্তর হচ্ছে, একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে পুঁজি ছাড়া রিযিক দেন, তাদের সংখ্যা অনেক। আর যাদের কাছে পুঁজি থাকে, তাদেরও অনেকের পুঁজি চুরি হয়ে যায় অথবা অন্যভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। মনে-প্রাণে একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে সে ব্যবহারই করবেন, যা আমার জন্যে মঙ্গলজনক। তিনি আমার ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দিলে তাঁর মতে এতেই কল্যাণ নিহিত আছে। ধন-সম্পদ কাছে থাকলে তা সম্ভবত ধর্ম-কর্ম বিনষ্টের কারণ হত। ধর্ম-কর্মের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দেয়া আল্লাহ তা'আলার একটি বড় অনুগ্রহ। এসব বিষয়ে বিশ্বাস অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে

গেলে পুঁজি থাকা না থাকা উভয়ই সমান হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে— কেউ রাতের বেলায় কোন একটি ব্যবসা করার ইচ্ছা করে, যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্যে ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর থেকে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাকে সেই ব্যবসা থেকে বিরত রাখেন। প্রত্যুষে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত বিষণ্ন মনে প্রতিবেশী অথবা অন্য কাউকে অলক্ষুণে সাব্যস্ত করে বলে ঃ আজ কার অশুভ মুখ দেখে বের হয়েছিলাম, যার ফলে আমার এই ব্যর্থতা; অথচ এটা তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটি অনুগ্রহ বৈ নয়। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ধনী হই কিংবা ফকীর— এতে আমার কোন পরওয়া নেই। কেননা, প্রাচুর্য ও দরিদ্রতার মধ্যে কোনটি আমার জন্যে মঙ্গলজনক, তা আমি জানি না।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী নয়, তার দ্বারা তাওয়াক্কুল সম্ভব নয়। এ কারণেই হযরত আবু সোলায়মান দারানী আহমদ ইবনে আবুল জাওয়ারীকে বললেন ঃ প্রত্যেক মকামেই আমার দখল আছে; কিন্তু তাওয়াক্কুলের গন্ধও আমি পাইনি। এতে তার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই, উচ্চস্তরের তাওয়াক্কুল তার হাসিল হয়নি।

সারকথা, তাওয়াক্কুলের মকাম দুর্বোধ্য নয়; কিন্তু এটা মনের শক্তি ও বিশ্বাসের জোর দাবী করে। তাই হযরত সহল বলেন ঃ যে ব্যক্তি উপার্জনের কারণে ভর্ৎসনা করে, সে সুন্নতকে ভর্ৎসনা করে। আর যে ব্যক্তি উপার্জন বর্জনের কারণে তিরস্কার করে, সে তাওহীদের প্রতি তিরস্কার করে।

এখন এমন প্রতিকার লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, যা অন্তরকে বাহ্যিক উপায়াদি থেকে ফিরিয়ে নিতে উপকারী এবং গোপন উপায়াদি সরবরাহ করার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি সুধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক। জানা উচিত যে, কুধারণা শয়তানের উপদেশ এবং সুধারণা আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা। সে মতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً وَّفَضْلًا -

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ওয়াদা দেয় এবং নির্লজ্জ কাজের নির্দেশ করে। আর আল্লাহ আপন বখশিশ ও কৃপার অঙ্গীকার করেন।

কেননা, মানুষ মজ্জাগতভাবে শয়তানের ভীতি প্রদর্শনের আনুগত্য

করে। যখন তার মধ্যে ভীরুতা ও আন্তরিক দুর্বলতা বেড়ে যায়, তখন কুধারণা প্রবল হয়ে যায় এবং তাওয়াক্কুল সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। বর্ণিত আছে, জনৈক আবেদ সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করতে থাকে। মসজিদের ইমাম তাকে বলল ঃ কিছু কাজ-কর্ম করে খেলে তোমার জন্যে ভাল হবে। আবেদ কোন উত্তর দিল না। ইমাম সাহেব তিনবার একই কথা বলে কোন জওয়াব পেল না। চতুর্থবার বলার পর আবেদ বলল ঃ মিয়া সাহেব, মসজিদের নিকটবর্তী জনৈক ইহুদী আমাকে প্রত্যহ দু'টি রুটি দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। ইমাম বলল ঃ যদি সে দায়িত্ব গ্রহণে সত্যবাদী হয়, তবে তোমার মসজিদে অবস্থান ভাল। আবেদ বলল ঃ আপনি কি আল্লাহ তা'আলার সামনে এবং মুসল্লীগণের সামনে এমন অসম্পূর্ণ তাওহীদ নিয়ে দণ্ডায়মান হন? ইমামতি না করাই আপনার জন্যে উত্তম। কারণ, আপনি ইহুদীর সত্য ওয়াদাকে আল্লাহ তা'আলার রিযিক সম্পর্কিত ওয়াদার উপর অগ্রাধিকার দেন।

একবার কোন এক মসজিদের ইমাম জনৈক মুসল্লীকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কোথা থেকে খাওয়া-দাওয়া কর? মুসল্লী বলল ঃ একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রথমে সে নামায পুনরায় পড়ে নেই, যা আপনার পেছনে পড়েছি। এরপর আপনার প্রশ্নের জওয়াব দেব।

গোপন উপায়াদির মাধ্যমে রিযিক প্রেরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা রাখার জন্যে সে সব কাহিনী শ্রবণ করা উপকারী, যাতে তাঁর অভূতপূর্ব কৃপা ও অনুগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্যবসায়ী ও ধনী লোকদের ধন-সম্পদ বরবাদ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের খাদেম ছিল হুযায়ফা মারআশী। তাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি হযরত ইবরাহীমের মধ্যে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক বিষয় কি দেখেছ? হুযায়ফা বলল ঃ আমরা একবার মক্কা মোয়াযযমার পথে খাদ্যাভাবে কয়েকদিন অভুক্ত থাকি। এরপর কুফায় পৌছে একটি উজাড় মসজিদে প্রবেশ করি। হযরত ইবরাহীম আমাকে দেখে বললেন ঃ মনে হয় তুমি খুব ক্ষুধার্ত। আমি বললাম ঃ আপনার ধারণা যথার্থ। তিনি বললেন ঃ কাগজ ও কালি নিয়ে এস। আমি কাগজ ও কালি নিয়ে এলে তিনি তাতে লিখলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম— সর্বাবস্থায় তুমিই লক্ষ্য এবং সবকিছুতে তুমিই প্রার্থিত। অতঃপর নিজেদের দুরবস্থা ও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা সম্বলিত কয়েক লাইন কবিতা লিখে চিরকুটটি আমার হাতে অর্পণ করে বললেন ঃ বাইরে যাও এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারও সাথে মন লাগিও না। পথে সর্বপ্রথম যাকে পাবে, তাকেই এই চিরকুট দেবে। আমি বের হলাম এবং সর্বপ্রথম যাকে পেলাম, সে ছিল খচ্চর আরোহী। আমি তাকে চিরকুটটি দিলে সে তা পাঠ করে কান্নাকাটি করল। সে প্রশ্ন করল ঃ এই চিরকুট লেখক এখন কোথায় আছেন? আমি বললাম ঃ অমুক মসজিদে। সে আমার হাতে একটি থলে দিল, তাতে ছয়শ' দীনার ছিল। এরপর কিছুদূর এগুতেই আমি অন্য এক ব্যক্তিকে দেখলাম। আমি তার কাছে প্রথম ব্যক্তির অবস্থা জানতে চাইলে সে বলল ঃ সে একজন খৃস্টান।

অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীমের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ এখনই এসব দীনার স্পর্শ করবে না। লোকটি এক্ষণি আসবে। এরপর এক মুহূর্ত অতিবাহিত হতেই সে খৃস্টান এল এবং হযরত ইবরাহীমের মস্তক চুম্বন করতে লাগল।

আবু এয়াকুব বসরী বলেন ঃ আমি একবার হেরেম শরীফে দশদিন ক্ষুধার্ত ছিলাম। ফলে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করছিলাম। মনে মনে বাইরে যাওয়ার কথা চিন্তা করলাম এবং দুর্বলতা দূর করার জন্যে কিছু পাব ভেবে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে আমি একটি শালগম মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তা তুলে নিলাম। কিন্তু সেটা খেতে কেন জানি আমার মন প্রস্তুত হল না। অতঃপর মনে হল কে যেন আমাকে বলছে— তুমি দশদিনের ভুখা থেকে অবশেষে একটি পচা শালগম তুলে নিলে? আমি শালগমটি ফেলে দিয়ে আবার হেরেম শরীফে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি, এক অনারব আমার দিকে চলে আসছে। সে এসে আমার সামনে বসে গেল এবং একটি পুঁটলি আমার সামনে রেখে বলল ঃ এটা আপনার জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম— আপনি এটা বিশেষভাবে আমাকে দিলেন কেন? সে বলল ঃ আসলে ঘটনা হল, আমরা দশদিন সমুদ্রে ছিলাম। আমাদের জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন আমি মানত করলাম, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে রক্ষা করেন, তবে আমি এই পুঁটলি কা'বার খাদেমদের মধ্য থেকে তাকেই দেব, যার উপর আমার প্রথম দৃষ্টি পড়বে। এখন আপনাকেই আমি সর্বপ্রথম দেখেছি। সুতরাং বিশেষভাবে আপনাকে দেয়ার এটাই কারণ। আমি বললাম ঃ আচ্ছা, এটা খুলুন।

খোলার পর দেখা গেল তাতে মিসরের ময়দা, খোসা ছাড়ানো বাদাম এবং বরফী (চিনি দুধ দ্বারা তৈরী এক প্রকার মিষ্টি) ছিল। আমি প্রত্যেক প্রকার থেকে এক এক মুষ্টি নিয়ে বললাম ঃ অবশিষ্টটুকু আমার পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গীদেরকে উপহার দেবেন। আমি আপনার মানত কবুল করলাম। এরপর আমি মনে মনে বললাম ঃ তোমার রিযিক তো দশ মনযিল দূর থেকে চলে তোমার কাছে আসে, আর তুমি জঙ্গলে তা তালাশ কর!

আবু সাঈদ সেরায বলেন ঃ আমি পাথেয় ছাড়াই এক জঙ্গলে গেলাম এবং উপোসের পর উপোস করতে লাগলাম। একদিন দূরে একটি মনযিল দেখে এই ভেবে খুশী হলাম যে, আর দেরী নয়— এই তো পৌঁছে গেলাম। পরক্ষণেই মনে মনে চিন্তা করলাম, আমি গায়রুল্লাহর উপর ভরসা করেছি। তখনই কসম খেলাম, আমি এই জনপদে যাব না, যে পর্যন্ত কেউ নিজে আমাকে না নিয়ে যায়। অতঃপর আমি নিজের জন্যে বালুর মধ্যে একটি গর্ত খনন করে তাতে নিজের দেহ বুক পর্যন্ত ঢেকে দিলাম। মাঝরাতে সেখানকার লোকেরা শুনতে পেল, কে যেন উচ্চস্বরে বলছে— হে বস্তিবাসীরা! আল্লাহ তা'আলার একজন ওলী নিজেকে এই বালুর মধ্যে বন্দী করে নিয়েছে। তোমরা তার খবর নাও। অতঃপর কয়েকজন লোক এসে আমাকে টেনে বালু থেকে বের করল এবং বস্তিতে নিয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরজায় পড়ে থাকত। একদিন হঠাৎ সে শুনল ঃ তুমি ওমরের উদ্দেশে হিজরত করেছিলে, না আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে? যাও এবং কোরআন শিখ। কোরআন তোমাকে ওমরের দরজা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবে। লোকটি তখনই সেখান থেকে প্রস্থান করল এবং নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। হযরত ওমর তার খোঁজ করালেন। জানা গেল, সে নির্বাস অবলম্বন করেছে এবং এবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে। হযরত ওমর (রাঃ) তার কাছে গিয়ে বললেন ঃ তোমাকে দেখার জন্যে আমার খুব বাসনা হয়েছিল। কি কারণে তুমি আমার সাথে দেখা কর না? সে বলল ঃ আমি কোরআন শিখেছি। কোরআনই আমাকে ওমর ও ওমর পরিবার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি কালামে মজীদে কি পেয়েছ? লোকটি বলল ঃ আমি পেয়েছি – وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ অর্থাৎ, 'আকাশে নিহিত রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যার ওয়াদা

তোমাদেরকে দেয়া হয়।' তখন আমি ভাবলাম, আমার রিযিক তো আকাশে। আমি এটা পৃথিবীতে খুঁজলে কোথায় পাব? হযরত ওমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ তোমার কথা ঠিক। এরপর থেকে তিনি লোকটির কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন।

আবু হামযা খোরাসানী বলেন ঃ এক বছর আমি হজ্জে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ এক কুয়ায় পড়ে গেলাম। আমার মন বলল ঃ সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করা দরকার। কিন্তু আমি বললাম, আল্লাহর কসম, কখনও ফরিয়াদ করব না। এমন সময় দু'ব্যক্তি সে কুয়ায় এল। তাদের একজন অন্যজনকে বলল এস, এই কুয়ার মুখ বন্ধ করে দেই, যাতে কেউ এতে না পড়ে যায়। এরপর তারা বাঁশ ও চাটাই এনে কুয়ার মুখ বন্ধ করে দিল। আমি চীৎকার করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আবার ভাবলাম, যার কাছে চীৎকার করব, তিনি তো এই ব্যক্তিদ্বয়ের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। তাই চুপ করে রইলাম। এর এক মুহূর্ত পরেই সেখানে কি যেন এল এবং কুয়ার মুখ খুলে পা ভেতরে নামিয়ে দিল। সে গুন্‌গুন্ শব্দে আমাকে বলল ঃ আমার পা জড়িয়ে ধর। আমি তাই করলাম। বাইরে আসার পর দেখি সেটি এক হিংস্র প্রাণী। প্রাণীটি তৎক্ষণাত সেখান থেকে চলে গেল। তখন গায়বী আওয়াজ শুনলাম, হে আবু হামযা! দেখ, আমি তোমাকে মৃত্যুর সাহায্যেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করলাম।

এমনি ধরনের অসংখ্য গল্প ও কাহিনী রয়েছে। কত উল্লেখ করা যায়! যদি ঈমান মযবুত হয়, এক সপ্তাহ অনাহারে থাকার ক্ষমতা থাকে এবং এই বিশ্বাসও পাকাপোক্ত হয় যে, সাতদিন পর্যন্ত রিযিক না পাওয়া গেলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তার মৃত্যুই উত্তম, তবে এসব গল্প-কাহিনী শুনে তাওয়াক্কুল পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। নতুবা দুর্বল ঈমান সহকারে এসব ঘটনা মোটেই উপকারী নয়।

এখন সন্তান-সন্ততিবিশিষ্ট ও ছাপোষা ব্যক্তির তাওয়াক্কুল সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রকাশ থাকে যে, ছাপোষা ব্যক্তির বিধান একা এক ব্যক্তির বিধান থেকে আলাদা। কেননা, একা এক ব্যক্তির তাওয়াক্কুল দু'টি বিষয় ছাড়া জায়েয নয়। এক, সপ্তাহকাল পর্যন্ত মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার অপেক্ষা না করে এবং মনেও সংকীর্ণতা অনুভব না করে কোন কিছু না খেয়ে থাকতে সক্ষম হওয়া। দুই, উপরে যে সকল বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো অর্জিত হওয়া। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, রিযিক পাওয়া না গেলে মৃত্যুর জন্যে এই ভেবে আন্তরিকভাবে সম্মত থাকা যে, এ ক্ষেত্রে

মৃত্যুই রিযিক। অর্থাৎ, তার জন্যে যে রিযিক উত্তম, অর্থাৎ আখেরাতের রিযিক, তাই সে পাবে। একা এক ব্যক্তির তাওয়াক্কুল এভাবেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ছাপোষা ব্যক্তির অবস্থা ভিন্ন। তার সন্তান-সন্ততিকে খামাখা ক্ষুধায় সবর করার জন্যে চাপ দেয়া জায়েয নয়। তাদের সামনে তাওহীদের পন্থায় বক্তৃতা দেয়াও সম্ভব নয় যে, অনাহারে মৃত্যুবরণ করা একটি উত্তম ও ঈর্ষাযোগ্য রিযিক। এমনিভাবে অন্যান্য বিশ্বাসও তাদের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। অতএব, ছাপোষা ব্যক্তির জন্যে উপার্জনকারীর অনুরূপ তাওয়াক্কুল করাই সমীচীন, যা তাওয়াক্কুলের তৃতীয় স্তর। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর তাওয়াক্কুল এমনি ছিল। তিনি জীবিকার জন্যে বাজারে রওয়ানা হয়েছিলেন। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যাওয়া এবং তাওয়াক্কুলের বাহানায় তাদের খবরদারী না করা হারাম। কেননা, মাঝে মাঝে এটা তাদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়, যার দায়িত্ব থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুক্তি পাবে না। হাঁ, যদি সন্তান-সন্ততিও কিছুদিন ভুখা থাকা মেনে নেয় এবং ক্ষুধায় মৃত্যুবরণকে রিযিক ও সৌভাগ্য মনে করে, তবে তার জন্যে তাওয়াক্কুল করা জায়েয।

মানুষের নফ্স তথা মনও তার সন্তান। একে বিনষ্ট করাও জায়েয নয়। যদি ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষমতা নফসের না থাকে এবং ক্ষুধার কারণে মন অস্থির থাকে— ঠিকমত এবাদত হতে না পারে, তবে এরূপ ব্যক্তির তাওয়াক্কুল করা জায়েয নয়। এ কারণেই বর্ণিত হয়েছে, আবু তোরাব বখশী এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকার পর খাওয়ার জন্যে তরমুজের ছাল তুলে নিয়েছে। তিনি তাকে বললেন ঃ তাসাওউফ তোমার জন্যে উপযুক্ত নয়। তুমি বাজারে গিয়ে কাজ-কর্ম কর। অর্থাৎ, তাওয়াক্কুল ছাড়া তাসাওউফ হয় না। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী পানাহার থেকে সবর করতে পারে, তারই তাওয়াক্কুল করা সাজে। হযরত আলী রুদবারী বলেন ঃ যদি কেউ পাঁচ দিন পরেই বলতে থাকে, সে ক্ষুধার্ত, তাকে বাজারে গিয়ে কাজ-কর্ম করতে বল।

মানুষের দেহও তার সন্তান। দেহের জন্যে ক্ষতিকর বস্তুতে তাওয়াক্কুল করা সন্তানের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল করার অনুরূপ। নফ্স ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে মানুষ যদি ক্ষুধায় সবর করার জন্যে নফসের উপর চাপ দেয়, তবে তা জায়েয; কিন্তু সন্তান-সন্ততিকে চাপ দেয়া নাজায়েয।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, উপায়াদি থেকে সরে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং দীর্ঘদিন ক্ষুধায় সবর করতে অভ্যস্ত হওয়া এবং ঘটনাক্রমে কোন সময় রিযিক আসতে বিলম্ব হলে মৃত্যুবরণে সম্মত থাকার নামই তাওয়াক্কুল।

যে ব্যক্তি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রহস্যাবলী নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে, সে নিশ্চিতরূপে জানে, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর ভেতরে এমন ব্যবস্থাপনা রেখেছেন, যাতে মানুষের কাছ থেকে তার রিযিক বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, যদি সে উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে। কেননা, যে মানুষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করার ক্ষমতাই রাখে না, সে-ও তো রিযিক পায়। যেমন, শিশু তার মায়ের গর্ভে অবস্থানকালে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার রিযিকের ব্যবস্থাকল্পে তার নাভি মায়ের নাভির সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন! ফলে মায়ের খাদ্য থেকে কিছু অংশ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তা নলের সাহায্যে শিশুর পেটে পৌঁছানো হয়। অথচ এতে শিশুর কোন কলাকৌশল নেই।

এরপর শিশু যখন মায়ের গর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন মায়ের মনে এমন স্নেহ ও দয়ার্দ্রতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়, যার ফলে সে অহরহ শিশুর ভরণপোষণে নিয়োজিত থাকে। এই ভরণ-পোষণ করতে সে বাধ্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই তার অন্তরে মায়া-মমতার দুর্নিবার অনল জ্বালিয়ে রাখেন। খাদ্য চিবানোর জন্যে যেহেতু শিশুর মুখে দাঁত থাকে না, তাই তার খাদ্য দুধ নির্দিষ্ট করা হয়, যা চিবানোর প্রয়োজন হয় না। শিশু তার নরম গঠন প্রকৃতির কারণে ঘন খাদ্য সহ্য করতে পারে না। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে মায়ের স্তন থেকে পাতলা দুধ তার জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। জিজ্ঞাসা করি, এতে শিশুর কোন চেষ্টা-তদবীর এবং মায়ের কোন কলাকৌশল থাকে কি?

এরপর যখন শিশু ঘন খাদ্য খাওয়ার বয়সে পৌঁছে, তখন তার মুখে চিবানোর জন্যে দাঁত, চোয়াল ইত্যাদি গজিয়ে উঠে। এরপর যখন আরও বড় হয় এবং নিজের প্রয়োজন নিজেই পূরণ করতে পারে, তখন তার জন্যে জ্ঞানার্জন ও আখেরাতের দিকে চলার পথ সুগম করে দেয়া হয়। এখন সাবালক হওয়ার পর রিযিকের জন্যে ভীরুতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা চরম মূর্খতা নয় কি? কেননা, সাবালক হওয়ার পর তার জীবিকার উপায়াদি হ্রাস পায়নি; বরং অনেক বেড়ে গেছে। প্রথমে সে উপার্জন করতে সক্ষম ছিল না। এখন সে ক্ষমতা এসে গেছে। পূর্বে তার প্রতি মায়া-মমতা, স্নেহ ও বাৎসল্য প্রদর্শনকারী ছিল মাত্র পিতামাতা। এখন আল্লাহ তা'আলা সে

মায়া-মমতা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা সমস্ত মুসলমান ও সমস্ত নগরীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে কেউ কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে করুণায় তার হৃদয় ভরে যায়, তার প্রতি দয়ার্দ্র হয় এবং তার অভাব মোচনে আগ্রহী হয়। সুতরাং পূর্বে তার প্রতি স্নেহশীল ছিল মাত্র একজন, আর এখন হাজারো। এতীমের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা এক ব্যক্তি অথবা অনেক ব্যক্তির অন্তরে তার প্রতি করুণা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করে দেন। ফলে সে এতীমকে নিজের কাছে এনে ভরণ-পোষণ করায়। দুর্মূল্যের বাজারেও আজ পর্যন্ত শুনা যায়নি, কোন এতীম অনাহারে ও অযত্নে মারা গেছে। অথচ সে নিজের ব্যাপারে কোন উৎকণ্ঠা বোধ করে না এবং তার কোন বিশেষ ভরণ-পোষণকারী থাকে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার ভরণ-পোষণ সেই করুণার মাধ্যমেই করেন, যা তিনি মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অনেক এতীমকে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন, যা পিতামাতা বর্তমান আছেন এমন শিশুদের জন্যেও সহজলভ্য নয়।

এক্ষেত্রে বলা যায়, একটি কারণে মানুষ এতীমের ভরণ-পোষণ করে। তা এই যে, মানুষ তাকে বাল্যাবস্থার কারণে অক্ষমও অপারগ মনে করে। কিন্তু কর্মক্ষম সাবালক ব্যক্তির প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না। তার সম্পর্কে বলা হয়, সে সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হয়েও নিজের জন্যে উপার্জন করে না কেন? ফলে সে যাবতীয় করুণা ও অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত থাকে। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, যদি সাবালক ব্যক্তি অলস ও বেকার হয়, তবে তার জন্যে তাওয়াক্কুলের কোন অর্থ নেই, তার উচিত উপার্জন করে খাওয়া। পক্ষান্তরে যদি সে কোন মসজিদে অথবা কক্ষে আল্লাহর কাজে মশগুল থাকে, জ্ঞানচর্চা করে অথবা এবাদতে নিয়োজিত থাকে, তবে তাকে কোন ব্যক্তিই তিরস্কার করে না যে, তুমি উপার্জন কর না কেন? বরং আল্লাহর কাজে মশগুল থাকার কারণেই মানুষের অন্তরে তার প্রতি মহব্বত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তারাই তার প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ করতে থাকে। তার দায়িত্ব কেবল এতটুকুই থাকে যে, মানুষের সামনে তার দরজা বন্ধ রাখবে না এবং তাদের কাছ থেকে গা-ঢাকা দিয়ে জঙ্গলে ও পাহাড়ে পলায়ন করবে না। কোন আলেম ও আবেদ শহরে থেকে সর্বক্ষণ আল্লাহর কাজে মশগুল থাকার পর অনাহারে মারা গেছে আজ পর্যন্ত একথা শুনা যায়নি, বরং এ ধরনের ব্যক্তি ইচ্ছা করলে আরও দশ জনকে কেবল

ইশারার মাধ্যমে খাওয়াতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহও তার হয়ে যান। যে আল্লাহর কাজে মশগুল থাকে, আল্লাহও তার মহব্বত মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন এবং মানুষের অন্তরকে তার এমন বশীভূত করে দেন, যেমন মায়ের অন্তর সন্তানের জন্য। তবে আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যবস্থা করেননি যে, যে ব্যক্তি তার কাজে মশগুল থাকবে, সে সুমিষ্ট হালুয়া, কোরমা, পোলাও ও আকর্ষণীয় পোশাক-পরিচ্ছদ সদাসর্বদা পেতে থাকবে; যদিও মাঝে মাঝে এসব পাওয়া যায়। তবে তিনি এই ব্যবস্থা অবশ্যই রেখেছেন যে, সে প্রতি সপ্তাহে যবের রুটি অথবা শাক, তরকারি ব্যঞ্জন অবশ্যই পাবে। অধিকাংশ সময় প্রয়োজনের অতিরিক্তও মিলে। এখন যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল বর্জন করে, সে শুধু এ কারণে বর্জন করে যে, তার মন সর্বদা আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা, উত্তম পোশাক ও চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যের প্রতি অনুমুখ। আখেরাতের পথে এসব বিষয়ের কোন মূল্য নেই এবং এগুলো উৎকণ্ঠা ছাড়া সহজলভ্য নয়। উৎকণ্ঠার মাধ্যমেও যৎকিঞ্চিতই অর্জিত হয়।

অতএব অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে চেষ্টা ও উৎকণ্ঠার প্রভাব দুর্বল। এ কারণে এরূপ ব্যক্তি নিজের কলাকৌশল ও উৎকণ্ঠার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে না; বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কৌশল দ্বারাই শান্তি লাভ করে, যিনি মানুষের এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, কোন মানুষের রিযিক থেকে যায় না এবং কেউ নিজের রিযিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে কদাচিৎ রিযিক পৌঁছাতে বিলম্ব হয়ে যায়, যা খুবই বিরল ঘটনা। কৌশল ও উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও তো মাঝে মাঝে বিলম্ব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এসব বিষয় হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি করবে এবং সাথে সাথে অন্তরে বীরত্বও থাকবে, তার অবস্থা হযরত হাসান বসরীর অনুরূপ হবে। তিনি বলেন, আমার মন চায়, বসরার সমস্ত অধিবাসী আমার পরিবারভুক্ত হোক অর্থাৎ, সকলের ভরণ-পোষণ আমার দায়িত্বে থাকুক। হযরত ওয়াহাব ইবনে ওয়ার্দ বলেন ঃ যদি আকাশ তামা এবং পৃথিবী রাঙতা হয়ে যায়, তারপরও যদি আমি রিযিকের জন্যে যত্নবান হই, তবে আমার ধারণায় আমি মুশরিক।

এসব বিষয় অনুধাবন করার পর পাঠকবর্গের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তাওয়াক্কুল একটি বোধগম্য বিষয়। যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে অধ্যবসায়ী, তার জন্যে তাওয়াক্কুলে পৌঁছা সম্ভব। আরও বুঝা যায়, যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল ও তার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করে, তার অস্বীকার আদ্যোপান্ত মূর্খতা।

প্রিয় পাঠক, আপনারা তাওয়াক্কুলের অস্তিত্ব ও সম্ভাব্যতার বিশ্বাস হারিয়ে বসবেন না। প্রত্যেকের উচিত অল্পে তুষ্ট থাকা এবং দিনাতিপাতের জন্যে যা দরকার, তা নিয়েই রাযী থাকা। এ পরিমাণ রিযিক প্রত্যেকের কাছে আসবে, যদিও সে তা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কেউ এরূপ বিশ্বাস সহকারে জীবন যাপন করলে আল্লাহ পাক এরূপ ব্যক্তির হাতে তার রিযিক পাঠিয়ে দেবেন, যার সম্পর্কে পূর্বে ধারণাও করা যায় না। তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলে মশগুল হওয়ার পর অভিজ্ঞতার দ্বারা এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করা যাবে—

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং ধারণাতীত স্থান থেকে তাকে রিযিক দান করবেন।

আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনায় রিযিকের যে সব গোপন উপায় রয়েছে, তা মানুষের জানা উপায়াদির তুলনায় অনেক বেশী; বরং রিযিক আসার পথ অসংখ্য। কেউ এসব পথ বর্ণনা করতে পারে না। কেননা, এগুলোর প্রকাশ পৃথিবীতে এবং কারণ আকাশে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ -

অর্থাৎ, আকাশে নিহিত আছে তোমাদের রিযিক এবং যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়।

আকাশের রহস্য সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। এর কারণেই এক দল লোক হযরত জুনায়দের খেদমতে হাযির হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি খুঁজছ? তারা বলল ঃ আমরা রিযিক খুঁজছি। তিনি বললেন ঃ যদি এর স্থান তোমাদের জানা থাকে, তবে খোঁজ। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইব। হযরত জুনায়দ বললেন ঃ যদি তোমরা মনে কর, তিনি তোমাদেরকে ভুলে যাবেন, তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দাও। তারা আরয করল ঃ আচ্ছা, আমরা ঘরে বসে থেকে তাওয়াক্কুল করব। এরপর কি হয় দেখব। তিনি বললেন ঃ অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে তাওয়াক্কুল করা সন্দেহের অন্তর্ভুক্ত। তারা আরয করল ঃ তা হলে আমরা কি করব? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ চেষ্টা-তদবীর পরিহার কর।

আহমদ ইবনে ঈসা খেরায বলেন ঃ একবার জঙ্গলে অবস্থানকালে আমার খুব ক্ষুধা লাগল। আমার মনে আল্লাহ তা'আলার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করার প্রবল ইচ্ছা হল। কিন্তু আমি বললাম ঃ এটা তাওয়াক্কুলকারীদের কাজ নয়। তখন মন আল্লাহ তা'আলার কাছে সবর প্রার্থনা করার উপর জোর দিল। আমি যখন সবরের দোয়া করার ইচ্ছা করলাম, তখন গায়েবী আওয়াজ হল— তুমি আমার নিকটবর্তী হওয়ার ইচ্ছা রাখ। যে আমার নিকটবর্তী হয়, সে ধ্বংস হতে পারে না। তুমি সংকটে পড়ে সবর প্রার্থনা করছ। মনে হয়, আমি তোমাকে দেখি না এবং তুমি আমাকে দেখ না।

সারকথা, পূর্ণাঙ্গ তাওয়াক্কুল হচ্ছে বান্দার তরফ থেকে অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত রিযিক পৌছানো। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিতে সাচ্চা। কেউ পরীক্ষা করতে চাইলে অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করে দেখে নিতে পারে।

প্রখ্যাত আলেম ও আবেদ ব্যক্তি যদি দিনে একবার যে কোন ধরনের খাদ্য দ্বারা এবং ধর্মপরায়ণদের জন্যে উপযুক্ত মোটা বস্ত্র দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারে, তবে এই পরিমাণ বস্তু সর্বদাই তার কাছে ধারণাতীত স্থান থেকে পৌছে যাবে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির তাওয়াক্কুল বর্জন করা এবং উপার্জনে যত্নবান হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর কথা। অবশ্য কেউ যদি অন্যের হাতে খেতে না চায় বরং নিজে উপার্জন করে খেতে চায়, তবে এটা সেই আলেমের জন্যে সমীচীন, যে বাহ্যিক এলেম ও আমল অনুযায়ী চলে এবং বাতেনী জগতের খবর রাখে না। কেননা, জীবিকার চিন্তা বাতেনী জগতের পরিপন্থী। অতএব, যে বাতেনী জগতে ভ্রমণ করে, তার জন্যে আধ্যাত্মিক কাজে মশগুল হওয়া এবং নিজ আগ্রহে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণকারীদের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করা উত্তম। কেননা, এতে করে সে জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলারই হয়ে থাকবে। এছাড়া সে দাতার সওয়াব লাভে সহায়ক হবে। আল্লাহ তা'আলার অব্যাহত রীতির প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায়, যে পরিমাণ উপায় অবলম্বন করা হয়, সে পরিমাণ রিযিক আসে না। এ কারণেই জনৈক পারস্য সম্রাট এক দার্শনিককে প্রশ্ন করলেন, কিছু কিছু নির্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত রিযিক দেয়া হয় এবং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বঞ্চিত থাকে, এর কারণ

কি? দার্শনিক জওয়াব দিলেন ঃ স্রষ্টার ইচ্ছা হল, মানুষ তাঁকে চিনুক। তাই এভাবে রিযিক দেয়া হয়েছে। যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি রিযিক পেত এবং নির্বোধ বঞ্চিত থাকত, তবে মানুষ মনে করত, বুদ্ধি বুদ্ধিমানকে রিযিক দিয়েছে। ব্যাপার যখন উল্টো হয়েছে, তখন সকলেই জেনেছে রিযিকদাতা বুদ্ধি নয়— অন্য কেউ।

এক্ষণে তাওয়াক্কুল ও উপায়াদি সম্পর্কে একটি পার্থিব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সামনে তাঁর সৃষ্টি মানবকুল কোন রাজকীয় প্রাসাদের সম্মুখস্থ বিশাল ময়দানে দাঁড়ানো অগণিত ভিক্ষুকের মত। বাদশাহ তার গোলামদের কাছে রুটি দিয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ কোন কোন ভিক্ষুককে দুটি এবং কোন কোন ভিক্ষককে একটি করে রুটি দেবে। আর চেষ্টা করবে, যাতে কেউ রুটি থেকে বঞ্চিত না হয়। এরপর বাদশাহ জনৈক ঘোষককে একথা ঘোষণা করতে বললেন, তোমরা সকলেই নিজ নিজ জায়গায় সস্থিরে দাঁড়িয়ে থাক এবং আমার গোলামদের জড়িয়ে ধরো না। তারা নির্দেশ অনুযায়ী তোমাদের কাছে রুটি পৌছে দেবে। যে ব্যক্তি গোলামদেরকে জড়িয়ে ধরবে এবং তাদের কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করবে, সে দু'রুটি নিয়ে চলে যাবে ঠিক, কিন্তু আমি তার পেছনে একটি গোলাম নিয়োজিত করব এবং এর শাস্তি সে দিন দেব, যে দিনকে আমি এর জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি। সে দিনটি কবে আসবে, তা আমি কাউকে বলি না। আর যে ব্যক্তি গোলামদেরকে বিরক্ত করবে না, তাদের কাছ থেকে এক রুটি নিয়ে চুপচাপ চলে যাবে, তাকে আমি সেই একই দিনে বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করব। যে ব্যক্তি নিজ স্থানেই দণ্ডায়মান থেকে দুটি রুটি পাবে, তাকে শাস্তিও দেব না, পুরস্কারও দেব না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গোলামদের কাছ থেকে কোন রুটি না পেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়বে, গোলামদের প্রতি রাগান্বিত হবে না এবং রুটি পাওয়ার বাসনাও করবে না, আমি তাকে নিজের উযীর নিযুক্ত করব এবং [illegible]রকারী ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত করব।

উপরোক্ত ঘোষণা শোনার পর ভিক্ষুকরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দল ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে প্রতিশ্রুত শাস্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করল না। তারা বলল ঃ আজ থেকে কাল পর্যন্ত অনেক সময়। আমাদের ক্ষুধা এ মুহূর্তেই। এই বলে তারা গোলামদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দুটি করে রুটি নিয়ে গেল। ফলে তারা প্রতিশ্রুত শাস্তির যোগ্য হয়ে গেল। ভিক্ষুকদের দ্বিতীয় দলটি শাস্তির ভয়ে গোলামদেরকে জড়িয়ে ধরল না; কিন্তু তীব্র ক্ষুধার কারণে রুটি দুটিই নিয়ে নিল। ফলে তারা শাস্তির কবল থেকে রক্ষা পেল এবং পুরস্কারও পেল না। তৃতীয় দল বলল ঃ গোলামদের দৃষ্টিপথে বসা উচিত, যাতে তারা আমাদেরকে ছেড়ে না যায়। কিন্তু রুটি একটিই গ্রহণ করা উচিত— দুটি নয়। হয়তো আমরা পুরস্কার পাব। সে মতে তারা ওয়াদা অনুযায়ী পুরস্কারের যোগ্য হল। ভিক্ষুকদের চতুর্থ দলটি ময়দানের কোণে কোণে আত্মগোপন করে গোলামদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করল। তারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ যদি আমাদেরকে খুঁজে বের করেই ফেলে, তবে একটিমাত্র রুটি নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। আর যদি ধরা না পড়ি, তবে সারারাত ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করলে উযীরের পদ ও বাদশাহের নৈকট্য লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা সফল হল না। গোলামরা প্রতি কোণে কোণে তালাশ করে তাদেরকে বের করে ফেলল এবং একটি করে রুটি পৌছে দিল। প্রত্যহ এমনি ধারা অব্যাহত রইল। কয়েকদিন পর ঘটনাক্রমে তাদের তিন ব্যক্তি এক কোণে লুকিয়ে রইল। গোলামদের দৃষ্টি তাদের উপর পড়ল না। ফলে তারা তীব্র ক্ষুধা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তাদের দু'ব্যক্তি বলল ঃ গোলামদের সামনে গেলেই আমাদের জন্যে ভাল হত। আমরা সবর করতে পারছি না। তৃতীয় ব্যক্তি কিছুই বলল না এবং ভোর হয়ে গেল। সে-ই উযীরের পদ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হল।

এই দৃষ্টান্তে ময়দান হচ্ছে পার্থিব জীবন, অজ্ঞাত মেয়াদ হচ্ছে কেয়ামত দিবস এবং উযীর পদের ওয়াদা হচ্ছে শাহাদতের অঙ্গীকার, যা তাওয়াক্কুলকারীর প্রাপ্য। কিন্তু শর্ত হল, ক্ষুধায় সম্মত অবস্থায় ওফাতপ্রাপ্ত হওয়া। এই অঙ্গীকারের প্রতিপালন কেয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত হবে না। কেননা, শহীদগণ আল্লাহ তা'আলার কাছে জীবিত থাকেন এবং রিযিক পান। বাদশাহের অনুগত গোলাম দ্বারা উপায়াদি বুঝানো হয়েছে। গোলামদেরকে জড়িয়ে ধরার অর্থ হল, উপায়াদি অবলম্বনে সীমা অতিক্রম করা। যারা ময়দানের মাঝখানে গোলামদের দৃষ্টিপথে স্থির বসে আছে,

তারা সেসব লোক, যারা শহরের খানকা ও মসজিদে বসে থাকে। কোণে আত্মগোপনকারী তারা, যারা তাওয়াক্কুল করে লোকালয় ত্যাগ করে এবং জঙ্গলে ভ্রমণ করে। উপায়াদি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তারা রিযিক পেয়ে যান। না পাওয়া খুবই বিরল। তাদের মধ্যে কেউ ক্ষুধার্ত ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় মারা গেলে সে শাহাদত ও নৈকট্য লাভ করে।

মানুষের মধ্যে সম্ভবত শতকরা নব্বই জন উপায়াদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সাত জন এমন, যারা শহরে অবস্থান করে এবং নিজের সুখ্যাতির মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করে। অবশিষ্ট তিন জন জঙ্গলে ঘুরাফেরা করে। তাদের দু'জন উপায়াদি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ এবং কেবল একজন নৈকট্য লাভে সক্ষম। সম্ভবত অতীত যমানায় এই পরিসংখ্যান হবে। আজকাল তো দশ হাজারের মধ্যে একজনও উপায়াদি বর্জন করে না।

(২) দ্বিতীয় ভাগে উপকারী বস্তুসমূহ সঞ্চয় ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্র, উপার্জন অথবা অন্য কোন উপায়ে ধনপ্রাপ্ত হয়, তার জন্যে সেই ধন সঞ্চয় করে রাখার মধ্যে তিনটি অবস্থা রয়েছে। এক, নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা থেকে গ্রহণ করবে অর্থাৎ, ক্ষুধার্ত হলে খাবে, বস্ত্রহীন হলে পরবে এবং গৃহের প্রয়োজন হলে গৃহ ক্রয় করবে। অবশিষ্ট যা থাকবে, তা তৎক্ষণাৎ দান করে দেবে। প্রয়োজনের এই পরিমাণ ছাড়া গ্রহণ করবে না এবং নিজের কাছে সঞ্চিত রাখবে না। রাখলেও এ নিয়তেই রাখতে পারবে। এরূপ ব্যক্তি বাস্তবে তাওয়াক্কুলের দাবী পূরণকারী। এটা সর্বোচ্চ অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা হল, প্রাপ্ত ধন-সম্পদ এক বছর অথবা আরও বেশী সময়ের জন্যে সংরক্ষিত রাখা। এ অবস্থা তাওয়াক্কুলকে বাতিল করে দেয় এবং এরূপ ব্যক্তি কিছুতেই তাওয়াক্কুলকারী নয়। কেউ কেউ বলেন ঃ কেবল তিন প্রকার প্রাণী সঞ্চয় করে থাকে— ইঁদুর, পিঁপড়া ও মানুষ। তৃতীয় অবস্থা হল, চল্লিশ দিন অথবা তারও কম সময়ের জন্যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা। এ অবস্থা মানুষকে তাওয়াক্কুলকারীদের জন্যে প্রতিশ্রুত প্রশংসনীয় মকাম থেকে বঞ্চিত করে কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ এ অবস্থা মানুষকে তাওয়াক্কুলের আওতা থেকে বের করে দেয়। খাওয়াস বলেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ধন-সম্পদ রেখে দিলে মানুষ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয়ে যায় না। এর বেশী দিন রাখলে খারিজ হয়। আবু

তালেব মক্কী বলেন ঃ চল্লিশ দিনের বেশী রাখলেও তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না। মূল সঞ্চয় যখন বৈধ, তখন এই মতভেদের কোন অর্থ নেই। হাঁ, কেউ মনে করতে পারে, সঞ্চয় করাই মূলত তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। অতএব সঞ্চয় না করাই উত্তম। যদি মনের দুর্বলতার কারণে সঞ্চয় করতেই হয়, তবে সঞ্চয় যত কম হবে, ততই উত্তম। হাদীসে জনৈক ফকীরের কিস্‌সা বর্ণিত আছে। মৃত্যুর পর তার গোসল দেয়ার জন্যে রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওসামা (রাঃ)-কে নির্দেশ করেন। তাঁরা তাকে গোসল দিয়ে যখন তারই চাদর দিয়ে তাকে কাফন পরালেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন যখন উঠবে, তখন তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত আলোকোদ্ভাসিত হবে। যদি একটি অভ্যাস তার মধ্যে না থাকত, তবে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল মুখমণ্ডল নিয়ে উঠত। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ সেটি কি অভ্যাস? তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি রোযাদারও ছিল, তাহাজ্জুদও পড়ত এবং আল্লাহ তা'আলার যিকিরও খুব করত। কিন্তু যখন শীতকাল আসত, তখন গ্রীষ্মকালীন কাপড়-চোপড় পরবর্তী গ্রীষ্মকালের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখত। এরপর যখন গ্রীষ্মকাল আসত, তখন শীতকালীন বস্ত্র পরবর্তী শীতকালের জন্যে রেখে দিত। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন ঃ

من اقل ما اوتيتم منه اليقين وعزيمة الصبر -

অর্থাৎ, যে বস্তু তোমাদেরকে স্বল্প পরিমাণে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে একীন তথা বিশ্বাস এবং সবরের দৃঢ়তা।

লোটা-বদনা, ঘটিবাটি, দস্তরখান ইত্যাদি যেসব বস্তু সর্বক্ষণ কাজে লাগে, সেগুলো এসবের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ, এগুলো রেখে দেয়া তাওয়াক্কুলের মর্তবা হ্রাস করে না। কিন্তু শীতকালীন কাপড়-চোপড়ের প্রয়োজন গ্রীষ্মকালে থাকে না। এ বিধান সে ব্যক্তির জন্যে, যার অন্তর সঞ্চয় বর্জন করার কারণে উদ্বিগ্ন হয় না। পক্ষান্তরে যদি সঞ্চয় না করলে মন অস্থির থাকে এবং এবাদত ও যিকির-ফিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তার পক্ষে সঞ্চয় করাই উত্তম। কেননা, অন্তরের সংশোধনই উদ্দেশ্য, যাতে সে আল্লাহর যিকিরের জন্যে প্রস্তুত থাকে। বলা বাহুল্য, রসূলে আকরাম (সাঃ) সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী,

কারিগর ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিও ছিল। তিনি ব্যবসায়ীকে ব্যবসা ত্যাগ করার হুকুম দেননি এবং কোন পেশাদারকে তার পেশা বর্জন করতে বলেননি। যারা এসব বিষয় বর্জনকারী ছিল, তাদেরকেও তিনি ব্যবসা অথবা পেশা অবলম্বন করার হুকুম দেননি। বরং তিনি সকলকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহবান করেছেন এবং বলেছেন, তোমাদের সাফল্য ও মুক্তি অন্তরকে দুনিয়ার দিক থেকে ফিরিয়ে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করার মধ্যেই নিহিত।

উপরে বর্ণিত যাবতীয় বিধানই একা ব্যক্তির জন্যে। সন্তান-সন্ততিওয়ালা ব্যক্তির বিধান, যদি সন্তান-সন্ততির দুর্বলতা দূর করা ও তাদের মনের স্থিরতার জন্যে এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত রাখে, তবে তা তাওয়াক্কুলের গণ্ডির বাইরে যাবে না। এর বেশী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করলে তা তাওয়াক্কুলকে বাতিল করে দেবে। কেননা, উপায়াদি প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে আসে। অতএব, বেশী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করার প্রয়োজন হয় না। রসূলে করীম (সাঃ) নিজের সন্তান-সন্ততির জন্যে এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত রেখেছেন এবং হযরত উম্মে আয়মন প্রমুখকে বলেছেন ঃ আগামীকালের জন্যে কিছু রেখো না। হযরত বেলাল ইফতারের জন্যে রুটির একটি টুকরা রেখে দিয়েছিলেন। তাঁকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ হে বেলাল, আরশের অধিপতি তোমাকে নিঃস্ব করে দেবেন, এরূপ ভয় করো না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে যে সঞ্চয় করেছেন, তাতে তাঁর তাওয়াক্কুল হ্রাস পায়নি। কারণ, তিনি নিজের সে সঞ্চয়ের উপর ভরসা করেননি; বরং তাঁর সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য ছিল উম্মতের জন্যে একটি সুন্নত পন্থা রেখে যাওয়া। কারণ, উম্মতের শক্তিশালী ব্যক্তিও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শক্তির তুলনায় দুর্বল। কাজেই তারা যাতে নৈরাশ্যের শিকার হয়ে যা করার ক্ষমতা আছে, তাও বর্জন না করে, সেজন্যে তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেছে, সঞ্চয় করা কিছু লোকের জন্যে ক্ষতিকর এবং কিছু লোকের জন্যে ক্ষতিকর নয়। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতই এর প্রমাণ। সুফ্ফায় বসবাসকারী জনৈক সাহাবীর ইন্তেকাল হলে তাঁর কাছে কাফনও পাওয়া গেল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তার পোশাক-পরিচ্ছদ তালাশ কর। তালাশ করার পর তা থেকে দুটি দীনার বের হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)

বললেন, এ দুটি দীনার হচ্ছে তার কলংকের দাগ। অথচ অন্য মুসলমানরা আরো বেশী ধন-সম্পদ রেখে মারা গেলে তিনি তাদের বেলায় এরূপ মন্তব্য করতেন না। এ হাদীসের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক, এগুলো দোযখের আগুনের দাগ। কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم -

অর্থাৎ, অতঃপর এর দ্বারা তাদের কপালে, পাশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে।

দুই, দাগ মানে পূর্ণতার স্তরে ত্রুটি। অর্থাৎ, মানুষের চেহারায় দাগ থাকার কারণে যেমন সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি এ দুটি দীনারের কারণে তার পূর্ণতার চেহারায় ত্রুটি দেখা দিয়েছে। মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ছেড়ে মারা যায়, তা আখেরাতে তার জন্যে লোকসানের কারণ হয়। তাই আখেরাতে পুরোপুরি লাভবান হতে হলে দুনিয়াতে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

হযরত বিশরের শিষ্য হোসাইন মানাযেলী বলেন ঃ আমি সকাল বেলায় হযরত বিশরের খেদমতে বসে ছিলাম, এমন সময় মাঝারি বয়সের গোধূম বর্ণের জনৈক বুযুর্গ গলা খাকারি দিতে দিতে তাঁর কাছে আসলেন। হযরত বিশর তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। এর আগে কারও জন্যে আমি তাঁকে দাঁড়াতে দেখিনি। অতঃপর তিনি আমার হাতে কয়েকটি দেরহাম দিয়ে বললেন ঃ ভাল খাবার নিয়ে আস এবং আমাদের জন্যে উপযুক্ত কোন সুগন্ধি আন। এর আগে এরূপ কথা তিনি কখনও আমাকে বলেননি। আমি খাবার নিয়ে এলে তিনি বুযুর্গের সাথে বসে আহার করলেন। অথচ এর আগে আমি তাঁকে কারও সাথে বসে আহার করতে দেখিনি। আহার শেষে দেখা গেল, অনেক খাবার বেঁচে গেছে। তখন সে বুযুর্গ বাড়তি খাদ্য নিজের কাপড়ে বেঁধে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। বুযুর্গের এই কাণ্ড দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। হযরত বিশর আমাকে বললেন ঃ মনে হয় তুমি মেহমানের এ আচরণ অপছন্দ করেছ। আমি আরয করলাম ঃ অবশ্যই। কারণ, তিনি অবশিষ্ট খাদ্য বিনা অনুমতিতে নিয়ে গেলেন। হযরত বিশর বললেন ঃ এই বুযুর্গ আমার ভাই হযরত ফাতাহ্ মুসেলী। আজ আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে তিনি সুদূর মুসেল থেকে এসেছিলেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি আমাকে এ শিক্ষা দিতে এসেছেন

যে, যখন তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন সঞ্চয় কোনরূপ ক্ষতি করে না।

(৩) তৃতীয় ভাগে উপকারী বস্তু থেকে উৎপীড়ন ও ক্ষতি প্রতিহত করা সম্পর্কে বলা হবে। জানা উচিত, ক্ষতির আশংকা কখনও অন্তরে এবং কখনও ধন-সম্পদে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ক্ষতি প্রতিহতকারী উপায়সমূহ বর্জন করা তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়। উদাহরণতঃ হিংস্র প্রাণীবহুল ভূখণ্ডে, বন্যার মুখে অথবা ভগ্ন প্রাচীরের নীচে শুয়ে থাকা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা পরিষ্কার নিষিদ্ধ। এরূপ ব্যক্তি নিজেকে অহেতুক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

ক্ষতি প্রতিহত করার উপায়গুলো তিন প্রকার— নিশ্চিত, সন্দিগ্ধ ও কল্পনাপ্রসূত। শেষোক্ত উপায়াদি বর্জন করা তাওয়াক্কুলের শর্ত। কল্পনাপ্রসূত উপায়াদি যেমন, লোহা পুড়িয়ে জন্তু-জানোয়ারকে দাগ দেয়া, মন্ত্র পড়া ইত্যাদি। এগুলো কখনও কোন ভয়ংকর রোগ দেখা দেয়ার পূর্বে এবং কখনও রোগ দেখা দেয়ার পরে করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাওয়াক্কুলকারীদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কেবল দাগ ও মন্ত্র বর্জন করাই উল্লেখ করেছেন। একথা তিনি কখনও বলেননি যে, তাওয়াক্কুলকারী যখন কোন শীতপ্রধান এলাকায় যাবে, তখন গরম জুব্বা পরিধান করবে না।

যদি কোন মানুষের পক্ষ থেকে নিপীড়ন হয় এবং তাতে সবর করতে পারে অথবা নিপীড়ন প্রতিহত করে প্রতিশোধ নিতে পারে, তবে সবর ও বরদাশত করাই তাওয়াক্কুলের শর্ত। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

واصبر على مايقولون واهجرهم هجرا جميلا

অর্থাৎ, তাদের কটূক্তির উপর সবর করুন এবং তাদেরকে উত্তম পন্থায় পরিত্যাগ করুন।

ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

অর্থাৎ, আমরা তোমাদের নিপীড়নে সবর করব। তাওয়াক্কুলকারীদের উচিত আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা।

دع اذاهم وتوكل على الله

অর্থাৎ, তাদের নিপীড়ন ছাড়ুন এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন।

نعم اجر الحا ماين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون -

অর্থাৎ, সেই কর্মীদের পুরস্কার কি চমৎকার, যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর তাওয়াক্কুল করে।

এসব আয়াত মানব কর্তৃক নিপীড়ন সম্পর্কিত। কিন্তু সাপের দংশন, হিংস্র জন্তুদের ক্ষতি সাধন ও বিচ্ছুদের দংশনে সবর করা এবং তাদেরকে প্রতিহত না করা তাওয়াক্কুলের মধ্যে গণ্য নয়।

ধনসম্পদ রক্ষা করার উপায়াদির বেলায়ও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য। উদাহরণতঃ কক্ষ ত্যাগ করার সময় যদি কক্ষের তালা লাগিয়ে দেয় অথবা বিশ্রামের সময় উটের পা বেঁধে ছেড়ে দেয়, তবে এতে তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, এসব উপায় আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত রীতি থেকে জানা গেছে। এগুলো অবলম্বন করায় কোন দোষ নেই। একবার জনৈক বেদুঈন তার উট ছেড়ে দিল এবং বলল ঃ আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তাওয়াক্কুল কর এবং উটের পদযুগলও বেঁধে দাও। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

خذوا حذركم

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের হাতিয়ার তুলে নাও।

যুদ্ধকালীন নামায সম্পর্কে বলেন ঃ

وياخذوا اسلحتهم

অর্থাৎ, তারা যেন তাদের হাতিয়ার সঙ্গে নেয়।

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل

অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্যে যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ কর এবং অশ্ব পালন কর।

হযরত মূসা (আঃ)-কে বলা হয়েছে ঃ

فاسر بعبادی لیلا

অর্থাৎ, এরপর রাতের বেলায় আমার বান্দাদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়।

রাতের বেলায় যাওয়ার অর্থ শত্রুপক্ষের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করা। এটা ক্ষতি প্রতিহত করার অন্যতম উপায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও ক্ষতি প্রতিহত করার জন্যে গিরিগুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। নামাযে হাতিয়ার সঙ্গে রাখা নিশ্চিত প্রতিরক্ষা নয়; যেমন সাপ ও বিচ্ছু মেরে ফেলা নিশ্চিত প্রতিরক্ষা। বরং হাতিয়ার সঙ্গে নেয়া একটি সন্দিগ্ধ উপায়। সন্দিগ্ধ উপায়ও নিশ্চিত উপায়ের মতই। সুতরাং এমন কাল্পনিক উপায়ই রয়ে গেছে, যা বর্জন করার দাবী তাওয়াক্কুল করে। বাঘ বুকের উপর থাবা মারার পরও কোন কোন ওলী সামান্যও নড়াচড়া করেননি এবং কেউ কেউ বাঘকে অনুগত বানিয়ে তার পিঠে সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করেছেন। ইত্যাকার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সেগুলো বাস্তবে সঠিক হলেও অনুসরণের জন্য শিক্ষা করা উচিত নয়। এগুলো কারামতের একটি উচ্চস্তর—তাওয়াক্কুলের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। যারা এই স্তরে পৌঁছে না, তারা এর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। এই স্তরে পৌঁছার আলামত কি? এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এই স্তরে পৌঁছে, সে নিজেই জেনে নেয় যে, সে এই স্তরে পৌঁছে গেছে। সে এর কোন আলামত জানতে চায় না। তবে এখানে এর কিছু পূর্বলক্ষণ বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্বলক্ষণ হচ্ছে, মানুষের সাথে তার অনুচর হয়ে একটি কুকুর রয়েছে, যার নাম ক্রোধ। তার কাজ হচ্ছে স্বয়ং মালিককে ও অন্যদেরকে কামড়াতে থাকা। প্রথমে এ কুকুর আনুগত্যশীল হবে। যদি সে এমন অনুগত হয় যাতে ইশারা দিলেই দৌড়ায় আর ইশারা না দিলে স্থবির হয়ে থাকে, তাহলে আস্তে আস্তে পশুরাজ সিংহের পক্ষেও মানুষের অনুগত ও অনুগামী হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু জঙ্গলের কুকুরের অনুগত হওয়ার তুলনায় ঘরের কুকুর অনুগত হলে তা অধিক উত্তম। আর দেহের কুকুরের অনুগত হওয়া ঘরের কুকুরের আনুগত্যের চেয়ে অনেক উত্তম। অন্তরের কুকুর অনুগত না হলে বাইরের কুকুর অনুগত হবে বলে আশা করা উচিত নয়। যখন কেউ শত্রুর ভয়ে অস্ত্র

সঙ্গে রাখবে, চোরের ভয়ে তালা লাগাবে এবং পালিয়ে যাবার ভয়ে উটের পা বেঁধে দেবে, তখন তাকে কোন্ দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলকারী বলা যাবে? এ প্রশ্নের জওয়াব, সে জ্ঞান ও হালের দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলকারী কথিত হবে। অর্থাৎ, তার এই জ্ঞান থাকবে যে, চোর প্রতিহত হলে তা আমার তালার কারণে নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার প্রতিহত করার দরুন প্রতিহত হয়েছে। কেননা, অধিকাংশ দরজায় তালা লাগিয়েও কোন উপকার হয় না। অনেক উট পা বাঁধার পরেও মারা যায় অথবা পালিয়ে যায়। অনেক সশস্ত্র ব্যক্তিও নিহত হয়। কাজেই এসব উপায়ের উপর ভরসা নেই। ভরসা কেবল উপায়ের স্রষ্টা আল্লাহর উপর। আর হালের দিক দিয়ে তাওয়াক্কুল হচ্ছে ঘর ও নিজের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং মুখে এরূপ বলা — ইলাহী! যদি তুমি আমার ঘরের জিনিসপত্র চুরি করার জন্যে কাউকে ক্ষমতা দাও, তবে তা তোমারই পথে উৎসর্গকৃত এবং আমি তোমার ফয়সালায় সম্মত। কেননা, তুমি আমাকে যা দিয়ে রেখেছ, তা আমার রিযিক, না অন্য কারও জন্যে লিখে দিয়েছ, তা আমার জানা নেই। আমি সর্বাবস্থায় তোমার ফয়সালায় রাযী।

এই হাল ও উপরোক্ত জ্ঞান থাকা অবস্থায় উটের পা বাঁধা, অস্ত্রসজ্জিত হওয়া এবং দরজায় তালা লাগানোর কারণে কেউ তাওয়াক্কুলের গণ্ডি থেকে খারিজ হবে না।

(৪) চতুর্থ ভাগে উপস্থিত ক্ষতি দূরীকরণে চেষ্টা-তদবীর সম্পর্কে বর্ণিত হবে। যেমন, রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি। উপস্থিত ক্ষতি দূর করার উপায়ও তিন প্রকার— নিশ্চিত, সন্দিগ্ধ ও সংস্কারপ্রসূত। নিশ্চিত উপায়, যেমন পিপাসার ক্ষতি দূরার করা জন্যে পানি পান করা, ক্ষুধার ক্ষতি দূর করার জন্যে খাবার খাওয়া ইত্যাদি। সন্দিগ্ধ উপায়, যেমন রোগের ক্ষতি দূর করার জন্যে রক্তমোক্ষণ করা, বিরেচক ওষুধ প্রয়োগে অন্ত্রশুদ্ধি ও অন্যান্য ডাক্তারী চিকিৎসা। সংস্কারপ্রসূত, যেমন লোহা পুড়ে দাগ দেয়া, তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করা ইত্যাদি।

নিশ্চিত উপায়াদি বর্জন করা তাওয়াক্কুল নয়; বরং মৃত্যুর ঝুঁকি থাকলে তা বর্জন করা হারাম। সংস্কারপ্রসূত উপায়াদি বর্জন করা অবশ্য তাওয়াক্কুলের শর্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাওয়াক্কুলকারীদেরকে এগুলো বর্জনকারী বলেছেন। এসব উপায়ের মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে দাগ দেয়া, এর

কাছাকাছি তন্ত্রমন্ত্র এবং সর্বশেষ হচ্ছে "শেগুন" তথা ভাবী শুভাশুভের নিদর্শন, সন্দিগ্ধ উপায়াদি– যেমন, চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা ও ওষুধপত্র সেবন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) এটা করেছেন এবং অন্যকে করতে বলেছেন। তিনি এর উপকারিতা পবিত্র মুখে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ তিনি বলেছেন ঃ

ما من داء الا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله الا الموت

অর্থাৎ, এমন কোন রোগ নেই, যার ওষুধ নেই। একে চিনে যে চিনে এবং চিনে না যে চিনে না। কিন্তু মৃত্যু রোগের কোন ওষুধ নেই।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

تداووا عباد الله فان الذى انزل الداء انزل الدواء

অর্থাৎ, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা কর। কেননা, যিনি রোগ নাযিল করেছেন, তিনি ওষুধও নাযিল করেছেন।

জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল ঃ ওষুধ ও মন্ত্র কি আল্লাহর আদেশ প্রতিহত করতে পারে? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ এগুলোও আল্লাহ তা'আলার অন্যতম আদেশ। অন্য এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন— তোমরা সতের, ঊনিশ ও একুশ বছর বয়সে শিঙ্গা লাগিয়ে শরীর থেকে বদরক্ত বের করে দাও— যাতে রক্ত উত্তেজিত হয়ে তোমাদের মৃত্যুর কারণ না হয়। এতে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে — (এক) রক্তের উত্তেজনা মৃত্যুর কারণ এবং (দুই) রক্ত বের করে দেয়া মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। কেননা, শরীর থেকে বদরক্ত রেব করা, পোশাকের ভিতর থেকে বিচ্ছু ঝেড়ে ফেলা এবং গৃহ থেকে সাপ তাড়িয়ে দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এগুলো বর্জন করা তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়; বরং এগুলো ঘরে আগুন লেগে গেলে তা নিভানোর জন্যে পানি ঢালার মত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনেক সাহাবাকে ওষুধ প্রয়োগ ও পরহেয করার (বাছ মেনে চলার) আদেশ দিয়েছেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর চক্ষু থেকে পানি ঝরত। এ জন্যে তিনি তাঁকে বললেন ঃ তুমি খোরমা খেয়ো না এবং এমন বস্তু খাও, যা তোমার মেযাজের সাথে মিল রাখে। অর্থাৎ, আটায় পাকানো শাক। হযরত সোহায়ব (রাঃ)-এর চোখে ব্যথা সত্ত্বেও যখন খোরমা খাচ্ছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ তুমি খোরমা খাও অথচ তোমার চোখে ব্যথা? সোহায়ব বললেন ঃ আমি অন্য চোয়াল দিয়ে খাচ্ছি। এ কথা শুনে তিনি হাসলেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নিজের চিকিৎসা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি প্রত্যেক রাত্রে চোখে সুরমা লাগাতেন, প্রতিমাসে শিঙ্গা দিয়ে বদরক্ত বের করতেন এবং প্রতিবছর জোলাব নিতেন। ওহী অবতরণের সময় তাঁর মাথায় ব্যথা হত। এ জন্যে তিনি মাথায় মেহেদির প্রলেপ দিতেন। যখমে মেহেদি লাগানোর কথাও কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। মোট কথা, নিজে চিকিৎসা করা ও অপরকে চিকিৎসা করতে বলা সম্পর্কে অসংখ্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কে "তিব্বুন্নবী (সাঃ)" নামে একটি পুস্তকও রচিত হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের জনৈক আলেমের কাহিনীতে লিখিত আছে, একবার হযরত মূসা (আঃ) রোগাক্রান্ত হলে বনী ইসরাঈল তাঁর কাছে এসে রোগ নির্ণয় করল এবং আরয করল ঃ আপনি যদি এ চিকিৎসা করেন, তবে সুস্থ হয়ে যাবেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ আমার চিকিৎসার দরকার নেই। আল্লাহ তা'আলা চিকিৎসা ছাড়াই আমাকে আরোগ্য দান করবেন। এরপর রোগ আরও বেড়ে গেল। লোকেরা এসে আরয করল ঃ এ রোগের ওষুধ তাই, যা আমরা বলেছি। এটা আমাদের পরীক্ষিত। মূসা (আঃ) এবারও অস্বীকার করলেন। ফলে রোগ বেড়েই চলল। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ওহী পাঠালেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, লোকদের বর্ণিত ওষুধ প্রয়োগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে সুস্থ করব না। এরপর বনী ইসরাঈল এসে তাকে সে ওষুধ খাইয়ে দিলে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। কিন্তু মনে কিছু খটকা রয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা আবার ওহী পাঠালেন ঃ তুমি আমার উপর তাওয়াক্কুল করে আমার প্রজ্ঞার ব্যবস্থাপনাকে এলোমেলো করে দিতে চাও। বল তো ওষুধের মধ্যে উপকারিতা কে রেখেছে? ওষুধ আমার আদেশে আরোগ্য দান করে। জনৈক পয়গাম্বর ধাতুদুর্বলতায় আক্রান্ত হলে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে গোশ্‌ত ও দুগ্ধ খাওয়ার আদেশ দেয়া হয়। কারণ, এগুলো বলকারক। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নবীর কাছে অভিযোগ করল যে, তাদের সন্তান-সন্ততি সুশ্রী হয় না। সেমতে নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করা হল— তোমার সম্প্রদায়কে বলে

দাও, তারা যেন তাদের গর্ভবতী মহিলাদেরকে "বিহী" নামক অম্ল ফল খাওয়ায়। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা কারণ ও ঘটনাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছেন, যাতে তাঁর প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে। ওষুধও আল্লাহর আদেশের অধীন একটি কারণ বা উপায়। অতএব, রুটি যেমন ক্ষুধার প্রতিকার এবং পানি যেমন পিপাসার প্রতিকার, তেমনি 'সিকঞ্জবীন' (অম্লরসের সঙ্গে চিনি সহযোগে প্রস্তুত উপকরণ বিশেষ) পিত্তের ওষুধ। এতে কেবল একটি বিষয়ের পার্থক্য। ক্ষুধার প্রতিকার রুটি দ্বারা এবং পিপাসার প্রতিকার পানি দ্বারা করা এতই সুস্পষ্ট যে, মানুষ মাত্রই তা জানে; কিন্তু পিত্তের চিকিৎসা সিকঞ্জবীন দ্বারা হয়, তা অল্প লোকেই জানে।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন ঃ ইলাহী, ওষুধ ও আরোগ্য কার হাতে? আল্লাহ বলেন ঃ আমার হাতে। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ তা হলে চিকিৎসক কি করে? আল্লাহ বললেন ঃ আমার কাছ থেকে আরোগ্য অথবা মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তারা রিযিক খায় এবং আমার বান্দাদেরকে আনন্দ দান করে।

প্রকাশ থাকে যে, পূর্ববর্তী মনীষী ও বুযুর্গগণের মধ্যে যারা অসুখে-বিসুখে চিকিৎসার শরণাপন্ন হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা অগণিত। আবার এমনও কিছু সংখ্যক মনীষী রয়েছেন, যাঁরা চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেছেন। উদাহরণতঃ অন্তিম মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খেদমতে কেউ কেউ আরয করল ঃ আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি বললেন ঃ চিকিৎসক আমাকে দেখেছে এবং বলেছে, আমি যা চাই, তাই করি। হযরত আবু যর (রাঃ)-এর চোখে ব্যথা ছিল। লোকেরা বলল ঃ আপনি চিকিৎসা করুন। তিনি বললেন ঃ আমার এ জন্যে কোন চিন্তা নেই। লোকেরা বলল ঃ আপনি সুস্থতা লাভের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ চোখের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি তাঁর কাছে দোয়া করব। রবী ইবনে খায়সাম (রাঃ) অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। লোকেরা তাঁকে চিকিৎসার পরামর্শ দিলে তিনি বললেন ঃ আমিও ইচ্ছা করেছিলাম; কিন্তু পর মুহূর্তেই আদ, সামুদ ইত্যাদি জাতির কথা মনে পড়ে গেল। তাদের মধ্যে অনেক চিকিৎসক ছিল। কিন্তু এখন চিকিৎসকও নেই, রোগও নেই। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেন ঃ যারা তাওয়াক্কুলে বিশ্বাস করে এ পথে চলে, তাদের জন্যে ওষুধ সেবনে চিকিৎসা না করাই

আমি ভাল মনে করি। স্বয়ং তাঁর কোন অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসকের জিজ্ঞাসারও তিনি কোন জওয়াব দিতেন না। হযরত সহলকে প্রশ্ন করা হল ঃ বান্দার তাওয়াক্কুল কখন সঠিক হয়? তিনি বললেন ঃ যখন সে দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, নিজের অবস্থাতেই মশগুল থাকে।

এ বুযুর্গগণের কর্মপদ্ধতি ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মপদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় কিরূপে হবে, এক্ষণে তাই আলোচ্য বিষয়। এই বুযুর্গগণের চিকিৎসা না করানোর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, রোগী যদি কাশফের স্তরে উন্নীত হয় এবং কাশফের মাধ্যমে জেনে নেয় যে, তার মৃত্যু নিকটবর্তী, চিকিৎসায় কোন উপকার হবে না, তবে চিকিৎসায় সম্মত না হওয়াই স্বাভাবিক। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অস্বীকৃতি এ কারণেই ছিল। তিনি কাশফবিশিষ্ট ছিলেন। অন্যথায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চিকিৎসা করতে দেখে এবং অপরকে চিকিৎসার জন্যে বলতে শুনে তিনি কিরূপে অস্বীকার করতে পারতেন?

দ্বিতীয় কারণ, রোগী নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত এবং নিজের পরিণতির ভয় ও অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ওয়াকিফহাল হওয়ার ব্যাপারে এত বেশী মশগুল যে, চিকিৎসার অবসরই নেই। এই দুঃখ ও আশংকায় সে রোগ-যন্ত্রণা অনুভব করতেই সক্ষম নয়, চিকিৎসা করবে কিসের? হযরত আবু যরের উক্তি এ বিষয়েরই পরিচায়ক। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি চোখের ব্যাপারে কোন চিন্তাই করি না। তাঁর ভেতরে গোনাহের ভয় যেন দৈহিক রোগ-যন্ত্রণার তুলনায় অনেক বেশী ছিল। এরূপ রোগীর অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় এত বেশী ভারাক্রান্ত যে, ক্ষুধার কষ্ট পর্যন্ত অনুভব করতে পারে না। তাকে খেতে বলা হলে সে বলে, আমার মোটেই ক্ষুধা নেই। এ থেকে বুঝা যায় না যে, সে ক্ষুধার অবস্থায় খাদ্য গ্রহণকে উপকারী বলে স্বীকার করে না।

তৃতীয় কারণ, রোগ অতিশয় পুরাতন এবং ওষুধ যা বলা হয়, তা সংস্কারপ্রসূত। যেমন, দাগ দেয়া, তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় রোগী চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানায়। রবী ইবনে খায়সামের উক্তিতে এ কারণের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, তাদের মধ্যে চিকিৎসক অনেক ছিল; কিন্তু কোন রোগীই বাঁচেনি, চিকিৎসকও রক্ষা পায়নি। উদ্দেশ্য, ওষুধের উপর ভরসা

নিশ্চিত নয়। যেসব বুযুর্গ চিকিৎসা বর্জন করেছেন, তাদের অধিকাংশের সনদ ছিল, ওষুধ তাদের মতে সংস্কারপ্রসূত ও অনির্ভরযোগ্য। চিকিৎসা বিশারদগণও সুস্পষ্টভাবে জানে, বাস্তবে কোন কোন ওষুধ মোটেই উপকারী নয় এবং কোন কোন ওষুধ উপকারী। কিন্তু যে চিকিৎসক নয়, সে প্রায়শই সব ওষুধকে একই দৃষ্টিতে দেখে। ফলে সে চিকিৎসাকে মন্ত্র পাঠের মতই সংস্কারপ্রসূত মনে করে।

চতুর্থ কারণ, চিকিৎসা না করে রোগী তার রোগ ধরে রাখতে চায়, যাতে উত্তম সবরের মাধ্যমে সে রোগের সওয়াব অর্জন করতে পারে অথবা আল্লাহ প্রদত্ত বিপদাপদে নফস সবর করার শক্তি রাখে কি না, তা পরীক্ষা করতে পারে। কারণ, রোগের সওয়াব সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন, পয়গম্বরগণের উপর অন্যান্য লোকের তুলনায় বেশী কঠিন বিপদাপদ আসে। এর পর তা স্তর অনুযায়ী হ্রাস পেতে থাকে। বান্দার উপর মুসীবত তার ঈমানের মাপ অনুযায়ী আসে। যে শক্ত ও পাকাপোক্ত ঈমানের অধিকারী, তার মুসীবতও কঠোরতর হয়। যার ঈমান যত দুর্বল, তার মুসীবতও সেই পরিমাণে হাল্কা হয়। এক হাদীসে আছে— আল্লাহ তা'আলা বিপদাপদ দ্বারা বান্দার পরীক্ষা নেন, যেমন তোমরা আগুনে পুড়িয়ে স্বর্ণের পরীক্ষা নাও। ফলে কোন কোন বান্দা খাঁটি ও উজ্জ্বল সোনা হয়ে বের হয়, কেউ কেউ তার চেয়ে কম এবং কেউ কেউ কাল পোড়া হয়ে বের হয়।

আহলে বায়ত থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে— আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে বন্ধু করে নেন, তখন তাকে বিপদে জড়িত করেন। যদি সে বিপদে সবর করে, তবে তাকে 'মুজতবা' (মনোনীত) করে নেন, আর যদি সে তাতে সন্তুষ্ট হয়, তবে 'মুস্তফা' (পবিত্র) করে নেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মুমিনকে যখনই দেখবে, আন্তরিকভাবে সুস্থ এবং দৈহিকভাবে রোগী পাবে। আর মোনাফেককে দেহের দিক দিয়ে অধিকতর সুস্থ এবং অন্তরের দিক দিয়ে অধিকতর রোগী পাবে।

লোকেরা যখন রোগ-শোক ও বালামুসীবতের এতদূর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য শুনল, তখন রোগ ও অসুখ-বিসুখের প্রতি তাদের মনে মহব্বত সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে কিছুসংখ্যক বুযুর্গের এটা রীতি হয়ে গেল যে, তারা নিজের রোগের কথা গোপন রাখতেন। চিকিৎসকদের কাছে প্রকাশ

করতেন না। তারা রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতেন, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকতেন। তারা আরও বিশ্বাস করে নিতেন যে, যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সবর সহকারে বসেই নামায পড়া যায়, তবে এটা সুস্থাবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ আমার বান্দার সে সৎকর্মই লেখে নাও, যা সে সুস্থাবস্থায় করত। কারণ, সে এখন আমার বন্দী। যদি আমি তাকে রেহাই দেই, তবে মাংসের বদলে উৎকৃষ্ট মাংস এবং রক্তের বদলে উত্তম রক্ত দান করব। আর যদি মৃত্যু দেই, তবে নিজের রহমতের দিকে মৃত্যু দেব।

হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ সুস্থ সবল অবস্থায় এবাদত করার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা করার চেয়ে চিকিৎসা না করা এবং এবাদতে দুর্বল ও অক্ষম থাকা উত্তম। তিনি এক বড় রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু কখনও এর চিকিৎসার ইচ্ছা করেননি।

পঞ্চম কারণ, রোগী পূর্বে কিছু গোনাহ করেছে। এখন গোনাহের ভয়ে অসুস্থ থাকাকে গোনাহের কাফ্ফারা মনে করে। তাই চিকিৎসা করতে সম্মত হয় না। কারণ, চিকিৎসা করলে রোগ দ্রুত সেরে যাবে এবং গোনাহের যথেষ্ট কাফ্ফারা হবে না। হাদীস শরীফে আছে— মানুষের শরীরে পুরাতন জ্বর সর্বক্ষণ এ জন্যে থাকে, যাতে সে পরিণামে শিলার মত সাফ ও পরিষ্কার হয়ে যায়— কোন গোনাহ অবশিষ্ট না থাকে। এক হাদীসে আছে— এক দিনের জ্বর সারা বছরের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়।

রসূলে করীম (সাঃ) যখন জ্বরকে গোনাহের কাফ্ফারা বললেন, তখন সাহাবী যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে সারা বছর জ্বরাক্রান্ত থাকার জন্যে দোয়া করলেন। তাঁর দোয়া কবুল হল এবং তিনি আমৃত্যু জ্বর থেকে মুক্ত হলেন না। কয়েকজন আনসারীও এরূপ দোয়া করেছিলেন। ফলে তাঁদেরও কোন সময় জ্বর ছাড়ত না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বললেন ঃ

من اذهب الله كريمتيه لم يرض له ثوابا دون الجنة

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যার চক্ষুদ্বয় নিয়ে যান, তার জন্যে তিনি জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াবে রাযী হন না।

এ কথা শুনে কিছুসংখ্যক আনসারী অন্ধ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতেন।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) এক ব্যক্তিকে খুব বিপদগ্রস্ত দেখে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী, এর প্রতি রহম করুন। এরশাদ হল ঃ আর কিরূপে রহম করব? এর মাধ্যমেই তো রহম করব। অর্থাৎ, বিপদ দিয়ে তার গোনাহ দূর করব এবং মর্তবা বৃদ্ধি করব।

ষষ্ঠ কারণ, রোগী অধিক স্বাস্থ্যবান থাকতে ভয় করে, যাতে সে অহংকার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে। তাই চিকিৎসা বর্জন করে। কেননা, স্বাস্থ্যবান হলেই মানুষ সবল হয়। আর সবল হলে আত্মম্ভরিতা ও অহংকার এসে যায়। আত্মম্ভরিতার ফল স্বরূপ মানুষ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন— দরিদ্রতা আমার জেলখানা। এতে তাকেই বন্দী করি, যাকে আমি ভালবাসি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে অবাধ্যতা ও গোনাহের আশংকা করে, তার কখনও চিকিৎসা না করানো উচিত। কেননা, গোনাহ না করার মধ্যেই তার কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত। জনৈক সাধক তাঁর শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি আমার কাছে কেমন ছিলে? সে উত্তর করল, কুশলেই ছিলাম। সাধক বললেন ঃ যদি তুমি কোন গোনাহ না করে থাক, তবে বাস্তবিকই কুশলে ছিলে। আর যদি কোন গোনাহ করে থাক, তবে গোনাহ্কারী ছাই কুশলে থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) ইরাকে ঈদের দিনের সাজসজ্জা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কি করছে? লোকেরা আরয করল; এটা তাদের ঈদ। তিনি বললেন ঃ যেদিন আমরা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করব না, সেদিনই হবে আমাদের ঈদ। আল্লাহ বলেন ঃ

وعصيتم من بعد مااراكم ماتحبون –

অর্থাৎ, তোমাদেরকে প্রিয় বস্তু অর্থাৎ, সুস্থতা দেখানোর পর তোমরা নাফরমানী করলে।

আরও বলা হয়েছে ঃ

ان الانسان ليطغى ان راه استغنى –

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষ নিজেকে অভাবমুক্ত দেখার কারণে সীমালঙ্ঘন করে।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ফেরাউন খোদায়ী দাবী করেছিল। এর কারণ, সে সুদীর্ঘ চারশ' বছর পর্যন্ত কোন রোগে আক্রান্ত হয়নি। কখনও মাথা ব্যথা হয়নি, দেহে তাপ দেখা দেয়নি এবং কোন শিরা দ্রুত চলেনি।

যদি একদিনও তার মাথায় ব্যথা দেখা দিত, তবে খোদায়ী দাবী করা দূরের কথা, অনর্থক কাজকর্ম থেকেও বিরত থাকত। তাই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اكثروا ذكر هادم اللذات

অর্থাৎ, তোমরা আনন্দ বিধ্বংসী মৃত্যুকে বারবার স্মরণ কর।

বলা হয়, জ্বর হল মৃত্যুদূত। বাস্তবিকই মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হলে মৃত্যুকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ –

অর্থাৎ, তারা কি দেখে না, তাদেরকে প্রতিবছর একবার অথবা দু'বার পরীক্ষা করা হয়? তারপরেও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না! অর্থাৎ, তাদেরকে অসুখে-বিসুখে জড়িত করে পরীক্ষা করা হয়।

এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ যখন দেখতেন, কোন বছর তাদের উপর দিয়ে জান অথবা মালের বিপদ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে গেছে, তখন তারা খুব ঘাবড়ে যেতেন। জনৈকা বুযুর্গ বলেন ঃ ঈমানদারের উপর প্রতি চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন না কোন বিপদ এসে যায়। বর্ণিত আছে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) জনৈক মহিলাকে বিয়ে করার পর তাঁর কোন দিন অসুখ-বিসুখ হল না। এ কারণে তিনি মহিলাকে তালাক দিয়ে দিলেন।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ অমুক রোগ এমন এবং মাথা ব্যথা এমন। এক ব্যক্তি বললেন ঃ মাথা ব্যথা কি, তা আমি জানিই না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। তিনি আরও বললেন ঃ কেউ যদি দোযখী

ব্যক্তিকে দেখতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখেন। হযরত আনাস ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে— রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল— কেয়ামতের দিন শহীদদের সাথেও কেউ থাকবে কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণ করে, তার হাশর শহীদদের সাথে হবে। বলা বাহুল্য, অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর কথা খুব স্মরণ হয়।

সারকথা, রোগব্যাধির এতসব উপকারিতা দৃষ্টে কোন কোন বুযুর্গ রোগ দূর করার কৌশল ও চিকিৎসা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। তাঁরা চিকিৎসা ক্ষতিকর জেনে বর্জন করেননি। যে চিকিৎসা রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত, তা ক্ষতিকর কেমন করে হতে পারে?

কিছু সংখ্যক বুযুর্গের মতে তাওয়াক্কুলের জন্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রয়োগ না করা সর্বাবস্থায় উত্তম। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চিকিৎসাকে সাধারণ মানুষের জন্যে সুন্নত করার লক্ষ্যে ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন। নতুবা এটা দুর্বলদের কাজ। যারা শক্তিশালী, তারা ওষুধ বর্জন করে তাওয়াক্কুল করবে। আমরা বলি, ওষুধ প্রয়োগ না করা তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত হলে ক্ষুধায় খাদ্য না খাওয়া এবং তৃষ্ণায় পানি পান না করাও তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত হবে। কেননা, ওষুধ যেমন রোগ নিরসনে সহায়ক, তেমনি পানিও তৃষ্ণা নিবারক। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ তা'আলা পানির মত ওষুধকেও এ জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। অথচ কেউ বলে না যে, তৃষ্ণায় পানি বর্জন করা তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত। ওষুধ প্রয়োগ না করা যে তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত নয়, এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনা।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার সাহাবায়ে কেরামের একটি দল খলীফার সঙ্গে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন। দামেশকের অদূরে জাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁরা খবর পান, সিরিয়ায় এখন মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। প্রত্যহ বহু লোক এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ব্যাপক আকারে প্রাণহানি ঘটছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। এক দল বললেন ঃ আমরা মহামারীর ভেতরে প্রবেশ করব না এবং জ্বলন্ত আগুনে লাফিয়ে পড়ব না। অন্য দল অভিমত প্রকাশ করলেন— আমরা সেখানে যাব। কেননা, কোরআন পাকে মৃত্যুর ভয়ে স্থান ত্যাগ করার নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَاِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ -

অর্থাৎ, "আপনি কি সে লোকদেরকে দেখেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল? অথচ তারা সংখ্যায় কয়েক হাজার।"

অতঃপর উভয় দল খলীফার খেদমতে হাযির হয়ে তার অভিমত জানতে চাইল। খলীফা বললেন ঃ এখান থেকে প্রস্থান করা উচিত এবং মহামারীর ভেতরে প্রবেশ না করা উত্তম। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদের অভিমত খলীফার বিপরীতে ছিল, তাঁরা আরয করলেন ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলার তাকদীর থেকে পালাব কি? খলীফা বললেন ঃ আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে তাঁরই তাকদীরের দিকে যাব। এতে দোষ কি? এর পর তিনি একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করে বললেন ঃ মনে কর, তোমাদের মধ্যে কারও কাছে একটি ছাগলের পাল আছে এবং বিচরণের জন্যে দুটি চারণভূমি আছে। একটি সবুজ ঘাসে পূর্ণ ও অপরটি শুষ্ক। পালের মালিক যদি সবুজ ঘাসবিশিষ্ট চারণভূমিতে ছাগল চরায়, তবু আল্লাহ তা'আলার আদেশে হবে এবং যদি সে শুষ্ক চারণভূমিতে চরায়, তবু আল্লাহ তা'আলার তাকদীর অনুযায়ী হবে। শ্রোতারা সকলেই খলীফার এই বক্তব্য যথার্থ বলে মেনে নিল। এরপর তিনি পরামর্শের জন্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে ডেকে পাঠালেন। পরের দিন হযরত আবদুর রহমান এসে বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এ সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখ থেকে যা শুনেছি, তাই আমার অভিমত। খলীফা বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, আপনি কি শুনেছেন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। হযরত আবদুর রহমান বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— "যখন তোমরা কোন ভূখণ্ডে মহামারীর কথা শুন, তখন সেখানে প্রবেশের দুঃসাহস দেখিও না। আর যদি যেখানে তোমরা আছ, সেখানেই মহামারী দেখা দেয়, তবে ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করো না।" হযরত ওমর (রাঃ) এই হাদীসে নিজের মতের সমর্থন দেখতে পেয়ে যারপর নাই আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জাবিয়া থেকে সরিয়ে আনলেন।

এখন দেখা উচিত, এ ধরনের বিষয় যদি তাওয়াক্কুলের শর্ত হয়, তবে সাহাবায়ে কেরাম কেমন করে তাওয়াক্কুল বর্জন করতে একমত হলেন? অথচ তাওয়াক্কুল দ্বীনের উচ্চতর মকামসমূহের অন্যতম।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে যে শহরে মহামারী থাকে, সেখান থেকে চলে যেতে কেন নিষেধ করা হল? অথচ চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী মহামারীর কারণ হচ্ছে বায়ু দূষিত হওয়া। দূষিত বায়ু থেকে বেঁচে থাকা একটি উত্তম চিকিৎসা। হাদীসে এর অনুমতি দেয়া হল না কেন? এর জওয়াব,

নিঃসন্দেহে দূষিত পরিবেশ থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ হতে পারে না। এতে কারও দ্বিমত নেই। দূষিত বায়ু কেবল বাহ্যিক দেহে লাগলেই ক্ষতি হয়ে যায় না; বরং সর্বক্ষণ এতে শ্বাস গ্রহণ করলে ক্ষতির আশংকা থাকে। যদি বায়ুতে রোগজীবাণু মিশ্রিত থাকে এবং তাতে বেশী মাত্রায় শ্বাস গ্রহণ করা হয়, তবে শ্বাসের মাধ্যমে জীবাণু দেহের অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে পৌঁছে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্যান্য অন্ত্রসমূহকে প্রভাবিত করে। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মহামারী এলাকায় বসবাস করার পর সেখান থেকে চলে যায়, তবে দূষিত বায়ুর প্রভাব থেকে মুক্ত না থাকাই তার জন্যে প্রবল। কিন্তু মুক্ত থাকারও সম্ভাবনা আছে। যেমন, প্রভাব দুর্বল হলে তার কোন ক্ষতি হবে না। অতএব, মহামারী থেকে পালিয়ে যাওয়া হল তা থেকে মুক্ত থাকার একটি সংস্কারপ্রসূত উপায়। যেমন, মন্ত্রপাঠ একটি সংস্কার প্রসূত উপায়। অতঃপর মহামারী থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণ যদি কেবল বায়ু দূষিত হওয়াই হত, তবে এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হত না এবং এর নিষেধাজ্ঞাও হত না। কিন্তু আসলে অন্য কারণে নিষেধাজ্ঞা হয়েছে। তা হলো, যদি সুস্থ লোকদেরকে দুর্গত এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তবে আক্রান্ত রোগীদের ছাড়া সেখানে সুস্থ লোক অবশিষ্ট থাকবে না। এমতাবস্থায় কে রোগীদের খাওয়াবে, পানি পান করাবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা-যত্ন করবে? এহেন পরিস্থিতিতে সুস্থদের সেখান থেকে চলে যাওয়া যেন রোগীদেরকে জীবন্ত সমাহিত করার শামিল, যাদের বেঁচে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সুস্থরা যদি সেখানে অবস্থান করে, তবে তাদের মরে যাওয়া যেমন নিশ্চিত নয়, তেমনি সেখান থেকে চলে গেলেও বেঁচে যাওয়া নিশ্চিত নয়। তবে তাদের চলে যাওয়ার ক্ষতি রোগীদের বেলায় অবশ্য নিশ্চিত। মুসলমানরা সকলেই পরস্পরে দালানের ইটের মত— একটির শক্তি অপরটির দ্বারা হয় অথবা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত— এক অঙ্গে ব্যথা হলে অন্য অঙ্গও ব্যথিত হয়। সুতরাং চলে যেতে নিষেধ করার কারণ আমাদের মতে এটাই।

যে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত দুর্গত এলাকায় প্রবেশ করেনি, তার জন্যে ব্যাপারটি উল্টো। অর্থাৎ, তার অভ্যন্তরে দূষিত বায়ু এখন পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেনি। তার দুর্গত এলাকায় প্রবেশ না করলেও সেখানকার রোগীরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে না। অবশ্য যদি ধরে নেয়া হয় যে, দুর্গত এলাকায় আক্রান্ত রোগীদের ছাড়া কেউ নেই এবং সেখানে সেবা-যত্ন ও শুশ্রূষার প্রয়োজন রয়েছে, তবে কিছু লোকের সেখানে যাওয়া শরীয়তে পছন্দনীয় বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। কেননা, তাদের

কোন ক্ষতি হওয়া একটি সংস্কারপ্রসূত বিষয় এবং তাদের যাওয়ার কারণে রোগাক্রান্ত মুসলমানদের ক্ষতি নিরসন হওয়া নিশ্চিত ব্যাপার। এ কারণেই হাদীসে মহামারী থেকে পলায়নকারীদেরকে জেহাদের সারি থেকে পলায়নকারীদের সমতুল্য বলা হয়েছে। কেননা, এ পলায়নের মধ্যে অন্য মুসলমানদেরকে বিপর্যস্ত করার প্রচেষ্টা পাওয়া যায়। এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। অনেক আবেদ ও সংসার নির্লিপ্ত ব্যক্তি এসব বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

উপরের আদ্যোপান্ত বক্তব্য থেকে একথাই স্পষ্ট হল যে, ওষুধ প্রয়োগ করা কোন কোন অবস্থায় উত্তম এবং কোন কোন অবস্থায় প্রয়োগ না করা উত্তম। আরও জানা গেল, ওষুধ প্রয়োগ করা ও না করা কোনটিই তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত নয়। শর্ত হলো কেবল সংস্কারপ্রসূত বিষয়াদি। যেমন, ঝাড়, ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র পাঠ ইত্যাদি বর্জন করা। এগুলো তাওয়াক্কুলকারীদের জন্যে শোভা পায় না।

জানা উচিত, অসুখ-বিসুখ, দারিদ্র্য ও বিপদাপদ গোপন রাখা পুণ্যের অন্যতম ভাণ্ডার এবং উচ্চ মর্তবার লক্ষণ। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সম্মত এবং তাঁর দেয়া বিপদে সবর করা বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার একান্ত বিষয়। এগুলো গোপন করা বিপদাপদ থেকে বেশীর ভাগ আত্মরক্ষার উপায়। এতদসত্ত্বেও নিয়ত সঠিক থাকলে এগুলো প্রকাশ করায়ও কোন দোষ নেই। যে সকল উদ্দেশ্যের কারণে রোগ-ব্যাধি প্রকাশ করা যায়, সেগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা। অর্থাৎ, চিকিৎসকের কাছে অভিযোগের ভঙ্গিতে নয়; বরং বাস্তব অবস্থা বর্ণনার ভঙ্গিতে হুবহু প্রকাশ করতে হবে। হযরত বিশর ইবনে আবদুর রহমান চিকিৎসকের কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করতেন।

দ্বিতীয়, রোগী অনুসরণীয় ব্যক্তি হলে সবর ও শোকর শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক ছাড়া অন্যদের কাছে নিজের রোগের কথা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ, এমনভাবে বর্ণনা করবে, যাতে বুঝা যায়, তার মতে রোগ একটি নেয়ামত। নেয়ামত সম্পর্কে যেভাবে আলোচনা করা হয়, সেভাবে আলোচনা করবে, যাতে মানুষ সে জন্যে শোকর করে। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যখন রোগী হামদ ও শোকরের পর নিজের ব্যথা বর্ণনা করে, তখন সে বর্ণনা অভিযোগের মধ্যে গণ্য হয় না।

তৃতীয়, নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি দীনতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে রোগ বর্ণনা করা। এটা এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ভাল মনে হয়, যার বীরত্ব ও শৌর্যবীর্য সর্বজনবিদিত। উদাহরণতঃ হযরত আলী

(রাঃ)-কে অসুস্থ অবস্থায় লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কেমন? তিনি বললেন ঃ খারাপ। প্রশ্নকারীরা এ উত্তরকে ভাল মনে করল না। এতে অভিযোগের গন্ধ পেল। তিনি বললেন ঃ আমি কি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করব? এভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের অক্ষমতা ও দীনতা প্রকাশ করাই উত্তম মনে করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন। অসুস্থ হয়ে তিনি দোয়া করতেন, ইলাহী! আমাকে মুসীবতে সবর দান করুন। এ দোয়া শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মুসীবতের প্রার্থনা তো তুমি নিজেই করেছ। আল্লাহ তা'আলার কাছে সুস্থতার দোয়া কর।

কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রোগের কথা প্রকাশ করে দেয়, সে সবর করে না। কোরআন মজীদে উল্লিখিত "সবরে জামীলে'র অর্থ এমন সবর, যাতে অভিযোগ নেই। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আপনার দৃষ্টিশক্তি কিসে বিনষ্ট করল? তিনি জওয়াব দিলেন— কালচক্র এবং দুঃখের আধিক্য। তৎক্ষণাৎ ওহী আগমন করল ঃ তুমি আমার বান্দাদের সামনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তৈরী হয়ে গেলে? হযরত ইয়াকুব আরয করলেন ঃ ইলাহী! আমি তওবা করলাম। আর কখনও এমন হবে না।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ রোগীর 'আহ' বলাকে খারাপ মনে করতেন। কেননা, এটা অভিযোগের পরিচায়ক। বর্ণিত আছে, হযরত আইউব (আঃ) যন্ত্রণায় "আহ" বলেছিলেন এবং তাঁর দুঃখ-কষ্টে এটাই ছিল শয়তানের ভূমিকা। হাদীসে আছে, বান্দা যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা উভয় ফেরেশতাকে নির্দেশ দেন— দেখ, সে তার অবস্থা জিজ্ঞেসকারীদের সাথে কি বলে। যদি সে তাদের সাথে আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করে, তবে ফেরেশতাদ্বয় তার জন্যে কল্যাণের দোয়া করে। আর যদি অভিযোগ করে, তবে ফেরেশতাদ্বয় বলে— তুমি এমনি থাকবে। জনৈক বুযুর্গ অভিযোগ হয়ে যাওয়া এবং কথা বেশী হওয়ার আশংকায় অবস্থা জিজ্ঞাসাকে খারাপ মনে করতেন। অসুস্থ হলে তিনি আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। কেউ তাঁর কাছে যেত না। সুস্থ হওয়ার পর নিজেই মানুষের কাছে যেতেন। এমনি অবস্থা ছিল ফোযায়ল ইবনে আয়ায, ওহাব ইবনে ওয়ার্দ ও বিশর ইবনে হারেসের। হযরত ফোযায়ল বলতেন, আমি চাই যাতে অসুস্থ হই; কিন্তু অবস্থা জিজ্ঞেসকারী কেউ না থাকুক। আমি তাদের কারণেই রোগী হতে অপছন্দ করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহব্বত

আল্লাহ তা'আলার মহব্বত হচ্ছে সকল মকামের চূড়ান্ত সীমা এবং সর্বোচ্চ মর্তবা। কারণ. মহব্বতের পর 'শওক' (আগ্রহ), 'উন্স' (অনুরাগ), 'রিযা' (সম্মতি) ইত্যাদি যত মকামই আসুক না কেন, সবই মহব্বতের অনুগামী ও ফল। মহব্বতের পূর্বে তওবা, সবর, যুহ্দ ও অন্যান্য যত মকাম রয়েছে, সবই মহব্বতের ভূমিকা। অন্যান্য মকামের অস্তিত্ব বিরল হলেও সব অন্তরে সেগুলোর সম্ভাবনা থাকে এবং সেগুলোর সম্ভাব্যতার বিশ্বাস থেকে কোন অন্তর শূন্য নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে বিশ্বাস স্থাপন করাই কঠিন। এমনকি, কোন কোন আলেম এর সম্ভাবনা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন— অব্যাহতভাবে তাঁর আনুগত্য করে যাওয়াই খোদায়ী মহব্বত। তাঁর সাথে সত্যিকার মহব্বত অসম্ভব। কেননা, মহব্বত সমজাতি ও সমশ্রেণীর সাথে হয়ে থাকে। তাঁরা মহব্বত অস্বীকার করার পর মহব্বতের অপরিহার্য বিষয়াবলী যেমন উন্স, শওক, রিযা ইত্যাদিও অস্বীকার করে বসেছেন। তাই আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

এ অধ্যায়ে দু'টি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহব্বতের আলোচনা

আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বত ঃ মুসলিম উম্মাহর সবাই এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের সাথে বান্দার মহব্বত থাকা ফরয। অতএব, আমাদের প্রশ্ন, যদি মহব্বতের অস্তিত্বই না থাকে, তবে তা ফরয কেমন করে হবে? মহব্বতের ব্যাখ্যা যারা আনুগত্যের দ্বারা করেন, তা-ও কিরূপে সম্ভব? কেননা, আনুগত্য তো মহব্বতের অনুগামী ও ফল। প্রথমে মহব্বত অস্তিত্ব লাভ করবে, এরপর প্রেমাস্পদের আনুগত্য হবে।

মহব্বতের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার এই এরশাদ—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

অর্থাৎ,আল্লাহ তাদেরকে মহববত করেন এবং তারা আল্লাহকে মহব্বত করে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ, যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহকে গভীরতর মহব্বত করে।

এ দুটি আয়াত থেকে জানা যায়, মহব্বতের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাতে পার্থক্য হয়ে থাকে। রসূলে আকরাম (সাঃ) অনেক হাদীসে আল্লাহর মহব্বতকে ঈমানের শর্ত বলেছেন। ঈমান কি? আবু রুযায়ন ওকায়লীর এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন ঃ তোমার কাছে দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা আল্লাহ ও রসূল অধিকতর প্রিয় হওয়া। এক হাদীসে আছে—

لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما -

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না যে পর্যন্ত না তার কাছে আল্লাহ ও রসূল দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হবে।

আরেক হাদীসে আছে—

لا يؤمن العبد حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين -

অর্থাৎ, বান্দা ঈমানদার হবে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পরিজন, ধন-সম্পদ ও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব। এক রেওয়ায়েতে ومن نفسه

অর্থাৎ, "তার নিজের চেয়ে অধিক" বলা হয়েছে।

তাই হওয়া দরকার। কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ

অর্থাৎ, বলুন, যদি তোমাদের বাপ-দাদা, পুত্র-পৌত্র, ভাই-বেরাদর, স্ত্রী, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, সঞ্চিত ধন-সম্পদ, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পছন্দনীয় বাসভবন তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও রসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জেহাদের চেয়ে, তবে তোমরা আল্লাহর (শাস্তির) আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

বলা বাহুল্য, শাসনের সুরেই একথা বলা হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) ও এ মহব্বতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

احبوا الله لما يغدوكم به من نعمة واحبوني لحب الله اياى

অর্থাৎ, আল্লাহকে মহব্বত কর এজন্যে যে, তিনি প্রতি সকালে তোমাদেরকে নিজের নেয়ামতে ভূষিত করেন, আর আমাকে মহব্বত কর এ কারণে যে, আল্লাহ আমাকে মহব্বত করেন।

এক রেওয়ায়েতে আছে— এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি আপনাকে মহব্বত করি। তিনি বললেন ঃ তা হলে দরিদ্রতার জন্যে প্রস্তুত থাক। লোকটি পুনরায় আরয করল ঃ আমি আল্লাহকে মহব্বত করি। তিনি বললেন ঃ তা হলে বিপদাপদের জন্যে তৈরী হয়ে যাও।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) মুসআব ইবনে ওমায়রকে কোমরে একটি ভেড়ার চামড়া জড়িয়ে আসতে দেখে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ এ লোকটিকে দেখ, আল্লাহ তা'আলা তার

অন্তরকে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। আমি তাকে তার পিতা-মাতার কাছে দেখেছিলাম। তারা তাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও সুপেয় পানি দিত। এখন আল্লাহ ও রসূলের মহব্বত তাকে এই স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, যেমন দেখতে পাচ্ছ। বর্ণিত আছে, মালাকুল মওত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জান কবয করতে এলে তিনি বললেন ঃ আপনি কি এমন কোন দোস্তকে দেখেছেন, যে তার দোস্তের প্রাণ সংহার করে? জওয়াবে আল্লাহ তা'আল তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন— তুমি কি এমন কোন মহব্বতকারীকে দেখেছ, যে তার হাবীবের সাথে সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে? এরপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) মালাকুল মওতকে বললেন ঃ এখন কবয করুন। এ বিষয়টি সে বান্দার কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে, যে আল্লাহকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে। সে যখন বুঝে, মৃত্যু সাক্ষাতের সিঁড়ি, তখন তার অন্তর মৃত্যুর জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। আল্লাহ ছাড়া মনোযোগ দেয়ার জন্যে কোন প্রেমাস্পদ তার থাকে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَايُقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ

وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে দান করুন আপনার মহব্বত ও সে ব্যক্তির মহব্বত, যে আপনাকে মহব্বত করে এবং সে বিষয়ের মহব্বত, যা আমাকে আপনার মহব্বতের নিকটবর্তী করবে। আপনার মহব্বতকে আমার কাছে ঠাণ্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয় করুন।

জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, কেয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি এর জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি আরয করল ঃ আমি অনেক নামায ও অনেক রোযার ভাণ্ডার গড়ে তুলিনি ঠিক; কিন্তু আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলকে মহব্বত করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

المرء مع من احب

অর্থাৎ, মানুষ যাকে মহব্বত করে, তার সঙ্গে থাকবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বললেন ঃ আমি এর আগে মুসলমানদেরকে এতটুকু উৎফুল্ল হতে দেখিনি, যতটুকু এ কথা শুনে তারা উৎফুল্ল হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার খাঁটি মহব্বতের স্বাদ পায়, সে স্বাদ তাকে দুনিয়াদারী থেকে বিরত রাখে এবং সমস্ত মানুষ থেকে তাকে দূরে রাখে।

হযরত ঈসা (আঃ) তিনটি লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তাদের দেহ ছিল ক্ষীণ এবং রং বিবর্ণ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এ দুরবস্থা কেন? তারা আরয করল ঃ দোযখের আগুনের ভয়ে। তিনি বললেন ঃ যারা ভয় রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই নিরাপদে রাখবেন। অতঃপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে আরও তিন ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন। তাদের দেহ আরও শীর্ণ ও রং আরও বিবর্ণ ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এই দুর্দশা কেন? তারা আরয করল ঃ জান্নাতের আগ্রহে আমাদের এ অবস্থা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা যে জান্নাত আশা কর, আল্লাহ অবশ্যই তা দান করবেন। অতঃপর তিনি আরও এগিয়ে তিন ব্যক্তির কাছে গেলেন। তাদের অবস্থা পূর্বোক্ত দু'দলের চেয়েও শোচনীয় ছিল। কিন্তু তাদের মুখমন্ডলে যেন স্বর্গীয় নূরের আভা ঝলমল করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি কারণে তোমরা এমন হয়ে গেছ? তারা আরয করল ঃ আমরা আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে মহব্বত করি। হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করলেন ঃ নৈকট্যশীল তোমরাই।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দ বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করলাম। সে বরফের উপর শুয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি বরফের শীতলতা অনুভব কর না? সে বলল ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে সদা গরম থাকে, সে শৈত্য অনুভব করে না।

হযরত সিররী সকতী বলেন ঃ যাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রবল নয়, কেয়ামতের দিন তাদেরকে পয়গম্বরগণের নামে ডাকা হবে। উদাহরণতঃ বলা হবে— হে উম্মতে মূসা, হে উম্মতে ঈসা এবং উম্মতে মুহাম্মদ (সাঃ)। কিন্তু মহব্বতওয়ালাদেরকে এভাবে ডাকা হবে— হে আল্লাহর ওলী, আল্লাহর দিকে চল। এতে তাদের মন খুশীতে বাগবাগ হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে হাইয়ান বলেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি যখন তার পরওয়ারদেগারকে চেনে, তখন তাকে মহব্বত করে। যখন মহব্বত করে,

তখন তাঁর দিকে মনোযোগী হয়। যখন সে এই মনোযোগের স্বাদ পায়, তখন দুনিয়ার দিকে খাহেশের দৃষ্টিতে তাকায় না এবং আখেরাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। দেহের দিক দিয়ে সে দুনিয়াতে থাকলেও তার আত্মা থাকে আখেরাতে।

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলার মহব্বত সম্পর্কে হাদীস ও মনীষীগণের বাণী এত বেশী যে, সেগুলো গণনা করে শেষ করা যায় না। এটা একটা সুস্পষ্ট বিষয়। অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা রয়েছে মহব্বতের অর্থ ও স্বরূপ নিরূপণের ক্ষেত্রে। তাই আমরা সেদিকেই মনোযোগ দিচ্ছি।

মহব্বতের স্বরূপ ও কারণাদি ঃ চেনা ও জানা ছাড়া মহব্বত হতে পারে না। মানুষ তাকেই মহব্বত করে, যাকে সে চেনে। জড় পদার্থ মহব্বত করে না। কারণ, তার মধ্যে চেনার শক্তি নেই। তাই মহব্বত একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষ যেসব বস্তু চেনে ও জানে, সেগুলো তিন প্রকার। এক, মানুষেরই স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও আনন্দদায়ক। দুই, মানব-স্বভাবের পরিপন্থী ও কষ্টদায়ক। তিন, আনন্দ ও কষ্ট কোন কিছুই দেয় না। এ তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে যে বস্তু চিনলে ও জানলে মানুষ আনন্দ ও সুখ পায়, সে বস্তুই মানুষের প্রিয় হয়ে থাকে। আর যে বস্তু চিনলেও জানলে কষ্ট হয়, সে বস্তু অপ্রিয় হয়ে থাকে। যে বস্তু চেনা-জানার পর কষ্টও হয় না, সুখও হয় না, সেটাকে প্রিয়-অপ্রিয় কোন কিছুই বলা যায় না।

কোন বস্তু প্রিয় হওয়ার অর্থ, মানব-স্বভাবে তার প্রতি ঝোঁক থাকা, আর অপ্রিয় হওয়ার অর্থ ঝোঁকের পরিবর্তে ঘৃণা থাকা। সুতরাং যে বস্তু থেকে আনন্দ পাওয়া যায়, সে বস্তুর প্রতি স্বভাবের ঝোঁক থাকার নাম মহব্বত। এই ঝোঁক যদি পাকাপোক্ত ও শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে তাকে বলা হয় এশ্ক। এ হচ্ছে মহব্বতের স্বরূপ, যা জানা অত্যন্ত জরুরী।

মহব্বত চেনা ও জানার অনুগামী। চেনা ও জানার হাতিয়ার হচ্ছে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বিধায় মহব্বতও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হবে। কেননা, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা একটি বিশেষ বস্তুকে চেনা যায় এবং বিশেষ বস্তু থেকেই আনন্দ পাওয়া যায়। উদাহরণতঃ চোখের আনন্দ দেখার বস্তুসমূহে। কানের আনন্দ হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত ও মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বরে। নাকের আনন্দ উৎকৃষ্ট সুগন্ধিতে। আস্বাদন শক্তির আনন্দ সুস্বাদু খাদ্যে। স্পর্শ শক্তির আনন্দ মৃদুতা ও কোমলতায়। এসব বস্তু ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয় বিধায় এগুলো প্রিয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

احب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرة عینی فی الصلوة -

অর্থাৎ, তোমাদের দুনিয়া থেকে আমার কাছে তিনটি বস্তু প্রিয়— সুগন্ধি, নারী এবং আমার চোখের শীতলতা নামাযে।

এখানে তিনি সুগন্ধিকে প্রিয় বলেছেন। বলা বাহুল্য, এতে চোখ ও কানের কোন অংশ নেই; বরং এতে কেবল ঘ্রাণশক্তির অংশ রয়েছে। নারীকে প্রিয় বলা হয়েছে। এতে ঘ্রাণ শক্তির অংশ নেই; বরং দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শ শক্তির অংশ রয়েছে।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের আনন্দে মানুষের সাথে চতুষ্পদ জন্তুও শরীক। অতএব, মহব্বতকে শুধু পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমিত করলে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চেনেন না ও জানেন না। এমতাবস্থায় মানুষের বৈশিষ্ট্য যে মহব্বত, তা নিষ্ফল সাব্যস্ত হবে এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়— যা দ্বারা মানুষ জন্তু-জানোয়ার থেকে পৃথক এবং যাকে বুদ্ধি, নূর, অন্তর ইত্যাদি বলা যায়, তা মিথ্যা হয়ে যাবে। এটা অবান্তর। কেননা, অন্তর্দৃষ্টি চর্মচক্ষুর তুলনায় অধিক শক্তিশালী। অন্তর চোখের তুলনায় অধিক চেনে ও জানে। অর্থসম্ভার— যা বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, তার সৌন্দর্য চোখে দেখা আকৃতিসমূহের তুলনায় অনেক বেশী। অতএব, অন্তর যে সকল ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয় অনুভব করে এবং অনুভব করে আনন্দ পায়, সে আনন্দও অধিক পূর্ণাঙ্গ হবে। কেননা, সুস্থ স্বভাবের ঝোঁক সেদিকে অধিক জোরদার হবে। এই ঝোঁকের নামই হল মহব্বত। এমতাবস্থায় যে খোদায়ী মহব্বতকে অস্বীকার করবে, সে চতুষ্পদ জন্তুর স্তরে অবস্থান করবে অথবা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির কাছে সর্বপ্রথম প্রিয় বস্তু হচ্ছে তার নিজের সত্তা। নিজ সত্তাকে মহব্বত করার উদ্দেশ্য হল, তার স্বভাবের মধ্যে আপন অস্তিত্ব ও তার স্থায়িত্বের বাসনা এবং নাস্তি ও ধ্বংসের প্রতি অনীহা। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের মজ্জার অন্তর্গত। সত্তার মহব্বতের

কারণেই মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবকে মহব্বত করে। এগুলোর প্রতি মহব্বতের কারণ স্বয়ং এগুলোর সত্তা নয়; বরং এগুলোর মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা নিশ্চিত হয় বলে। এ কারণেই মানুষ তার পুত্রকে মহব্বত করে, যদিও পুত্রের দ্বারা তার কোন উপকার হয় না এবং নানাবিধ কষ্ট ও পীড়া সইতে হয়। কেননা, তার মৃত্যুর পর পুত্রই হবে তার স্থলাভিষিক্ত। সে যেন বংশের স্থায়িত্বের মধ্যেও নিজের এক প্রকার স্থায়িত্ব দেখতে পায়। এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনের মহব্বত নিজ সত্তার মহব্বতের পূর্ণতার কারণেই হয়ে থাকে। কারণ, আত্মীয়-স্বজনের কারণে সে নিজেকে শক্তিশালী মনে করে এবং তাদের কৃতিত্বকে নিজের গৌরব মনে করে। এই বক্তব্য থেকে জানা গেল, প্রত্যেক মানুষের কাছে তার সত্তা, সত্তার পূর্ণতা ও তার স্থায়িত্ব মহব্বতের বিষয়। এ হচ্ছে মহব্বতের প্রথম কারণ।

মহব্বতের দ্বিতীয় কারণ অনুগ্রহ। কথায় বলে, মানুষ অনুগ্রহের দাস। অনুগ্রহকারীকে মহব্বত করা মানুষের মজ্জাগত। হাদীসে বর্ণিত আছে—

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَيَّ يَدًا فَيُحِبُّهُ قَلْبِيْ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! কোন পাপাচারীর অনুগ্রহ আমার উপর রেখো না। রাখলে আমার অন্তর তাকে মহব্বত করবে।

এতে ইঙ্গিত হয়, অনুগ্রহকারীকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করার ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক। এটি এড়ানো যায় না। এ কারণেই মানুষ কখনও এমন ব্যক্তিকে মহব্বত করে, যার সাথে তার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই— নিছক অপরিচিত।

মহব্বতের তৃতীয় কারণ কোন বস্তুকে সেই বস্তুর সত্তার কারণে মহব্বত করা, তার কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়ার কারণে নয়; বরং সে বস্তুর সত্তাই সাক্ষাৎ উপকার। এ মহব্বতকে হাকিকী তথা সত্যিকার মহব্বত বলা হয়। এরূপ মহব্বতের স্থায়িত্ব আশা করা যায়। উদাহরণতঃ রূপ-সৌন্দর্যের মহব্বত কেবল রূপ ও সৌন্দর্যের কারণেই হয়। এতে সৌন্দর্য চেনা ও অনুভব করাই সাক্ষাৎ আনন্দ। এখানে ধারণা করা উচিত নয় যে, সুশ্রী অবয়বের মহব্বত কাম-বাসনা চরিতার্থ করা ও বাসনা করা ছাড়া সম্ভব নয়। উচিত এজন্যে নয় যে, কাম-বাসনা চরিতার্থ করা একটি

ভিন্ন আনন্দ এবং স্বয়ং রূপও ভিন্ন আনন্দদায়ক। যেমন সবুজের সমারোহ ও বহমান পানিকে মহব্বত করা হয়, কিন্তু তা এ জন্যে নয় যে, এগুলোতে পানাহারের উপকার আছে। দেখা ছাড়া এগুলোতে অন্য কোন আনন্দ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবুজ শ্যামল বনানী ও বহমান পানিকে খুব মহব্বত করতেন। সকল সুস্থ মন বাগবাগিচা, ফুল, সুশ্রী জন্তু-জানোয়ার, মনোহারী ফুল ও ফলের বৃক্ষ এবং সুন্দর চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা আনন্দের কারণ মনে করে। এমনকি, মানুষ এগুলোর দ্বারা মনের দুঃখ দূর করে। এমন কোন রূপ-সৌন্দর্য নেই, যা অনুভব করাতে আনন্দ নেই। এখন যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্যশীল, তবে যার দৃষ্টিতে তার সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, তার কাছে অবশ্যই তিনি মহব্বতের পাত্র হবেন। হাদীসে বলা হয়েছে—

ان الله جميل يحب الجمال

অর্থাৎ, আল্লাহ সৌন্দর্যশালী। তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।

মহব্বতের চতুর্থ কারণ স্বয়ং-রূপ সৌন্দর্য। এখানে রূপ ও সৌন্দর্যের অর্থ বর্ণনা করা জরুরী। ভাবুক ও কল্পনা-বিলাসীদের মতে যার দৈহিক গড়ন সুসমঞ্জস, আকার-আকৃতি সঠিক এবং রং উজ্জ্বল গৌর, সে রূপবান ও সৌন্দর্যশালী। অধিকাংশ মানুষের মতেও যা দৃষ্টিকে তৃপ্তি দেয়, তাই সুন্দর। তাই তাদের ধারণা, যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না, যার আকার-আকৃতি নেই, রং ও বর্ণ নেই এবং কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয় না, তার রূপবান ও সৌন্দর্যশালী হওয়া সম্ভব নয়। যখন সৌন্দর্যশীল হবে না, তখন তাকে অনুভব করে আনন্দ হবে না। এটা তাদের বিরাট ভ্রান্তি। কেননা, দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া, গড়ন সুসমঞ্জস হওয়া এবং রং উজ্জ্বল হওয়ার মধ্যেই সৌন্দর্য সীমিত নয়। উদাহরণতঃ আমরা বলি, এই হস্তলিপি সুন্দর, এই কণ্ঠস্বর সুন্দর। এখানে গড়ন, আকার-আকৃতি ও রং কিছুই নেই। অতএব, বুঝা গেল, মুখাকৃতি ও অবয়বের মধ্যেই সৌন্দর্য সীমিত নয়।

প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্যের মাপকাঠি হচ্ছে তার মধ্যে তার উপযুক্ত ও সম্ভাব্য সকল গুণের সমাবেশ ঘটা। যখন কোন বস্তুর মধ্যে সম্ভাব্য সকল গুণের সমাবেশ হয়ে যাবে, তখন সে বস্তু হবে সর্বাঙ্গ-সুন্দর। যদি কতক গুণের সমাবেশ ঘটে, তবে সৌন্দর্যও সে তুলনায়ই হবে। উদাহরণতঃ

আমরা সে ঘোড়াকে সুন্দর বলব, যার মধ্যে সুশ্রী আকার-আকৃতি, রং-ঢং দ্রুতগতি ইত্যাদি সম্ভাব্য গুণ পূর্ণ মাত্রায় থাকে।

জানা দরকার, সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গাহ্য বিষয়াদির মধ্যেই সীমিত নয়; বরং ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়াদির মধ্যেও বিদ্যমান। উদাহরণতঃ আমরা বলি— এই চরিত্র কত সুন্দর। এই বিদ্যা কত ভালো। চরিত্র ও বিদ্যার মধ্যে কোনটিই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয় না; বরং অন্তর্দৃষ্টির নূর দ্বারা এগুলো উপলব্ধি করা হয়। এসব গুণ মানুষের প্রিয় এবং যারা এসব গুণে গুণান্বিত, তারাও প্রিয়। উদাহরণতঃ মানুষের এটা মজ্জাগত স্বভাব যে, তারা পয়গম্বরগণকে এবং সাহাবায়ে কেরামকে মহব্বত করে। অথচ তাদের কাউকে চোখে দেখেনি। মাযহাবসমূহের ইমামগণের মহব্বতও তেমনি। বলা বাহুল্য, তাঁদের এই মহব্বত বাহ্যিক আকার-আকৃতির কারণে নয়। বাহ্যিক আকার-আকৃতি তো কবে মাটির সাথে মিশে গেছে; বরং তাঁদের মহব্বতের কারণ হচ্ছে ধর্মীয় গুণাবলী যেমন, তাকওয়া, এলেম, ধর্ম প্রচার, শরীয়ত সম্পর্কে গবেষণা ইত্যাদি। এসব গুণের সৌন্দর্য অনুভব করা অন্তর্দৃষ্টির নূর ছাড়া সম্ভব নয়।

মহব্বতের পঞ্চম কারণ আত্মিক মিল, যা মহব্বতকারী ও মাহবুবের মধ্যে থাকে। প্রায়ই দু'ব্যক্তির মধ্যে প্রগাঢ় মহব্বত হতে দেখা যায়; কোন সৌন্দর্য ও উপকার পাওয়ার কারণে নয়; বরং কেবল আত্মিক মিলের কারণে। হাদীস শরীফে আছে—

فما تعارف منها ائتلف وماتناكر منها اختلف -

অর্থাৎ, আত্মাসমূহের যেগুলো পরস্পর পরিচিত হয়েছে, সেগুলো পরস্পর মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, আর যেগুলো পরিচিত হয়নি, সেগুলো পৃথক হয়ে গেছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে মহব্বতের পাঁচটি কারণ পাওয়া গেল। (এক) নিজের অস্তিত্বের পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের মহব্বত। (দুই) অনুগ্রহের কারণে মহব্বত। (তিন) কোন বস্তুর সত্তার কারণে মহব্বত করা। (চার) স্বয়ং রূপ-সৌন্দর্যের কারণে মহব্বত করা। (পাঁচ) আত্মিক মিলের কারণে মহব্বত। যদি এ কারণগুলো একই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে নিঃসন্দেহে মহব্বত বহুগুণ বেশী হবে।

মহব্বতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহর সত্তা ঃ মহব্বতের উপরোক্ত পাঁচটি কারণ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া অন্য কারও মধ্যে একত্রে পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাস্তবে মহব্বতের যোগ্যও তাঁর সত্তা— অন্য কেউ নয়। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত করে এবং এ মহব্বতকে আল্লাহর সাথে কোনরূপে সংযুক্ত না করে, তবে এটা হবে মূর্খতা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত উত্তম। কেননা, এটা হুবহু আল্লাহর মহব্বত। আলেম ও মুত্তাকী লোকদের মহব্বতও তদ্রূপ। কেননা, প্রেমাস্পদের প্রেমাস্পদও প্রেমাস্পদ হয়ে থাকে। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ মাহবুব কিংবা মহব্বতের যোগ্য নয়। এর ব্যাখ্যার জন্যে আমরা উল্লিখিত পাঁচটি কারণ উল্লেখ করে প্রমাণ করব, এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার মধ্যেই একত্রে পাওয়া যায়— অন্য কারও মধ্যে একটি অথবা দু'টি পাওয়া যায় মাত্র।

এখন প্রথম কারণ সম্পর্কে চিন্তা করুন। অর্থাৎ, মানুষ নিজের সত্তাকে মহব্বত করে এবং তার স্থায়িত্ব কামনা করে— ধ্বংস, নাস্তি ও ত্রুটি চায় না। এটা প্রত্যেক জীবিত মানুষের মজ্জাগত বিষয়। কেউ এ থেকে মুক্ত নয়। এটাই আল্লাহর মহব্বত দাবী করে। কেননা, যে ব্যক্তি নিজ সত্তা ও পালনকর্তাকে চেনে, সে নিশ্চিতরূপেই জানে, তার অস্তিত্ব তার নিজের পক্ষ থেকে নয়; বরং তার সত্তার অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই তার অস্তিত্বের স্রষ্টা এবং তিনিই পূর্ণতার গুণাবলী সৃষ্টি করে তাকে পূর্ণতা দান করেছেন। অন্যথায় মানুষ নিজ সত্তার দিক দিয়ে নিছক নাস্তি। আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় অস্তিত্ব দান না করলে এবং অস্তিত্বের পর তাঁর অনুগ্রহ সঙ্গে না থাকলে মানুষ নিঃসন্দেহে নিস্তনাবুদ হয়ে যাবে। অতএব পালনকর্তা, মারেফত অর্জনকারী ব্যক্তি যখন নিজের সত্তাকে মহব্বত করবে, তখন সে সত্তাকেও অবশ্যই মহব্বত করবে, যার দ্বারা তার সত্তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। যদি সে সত্তাকে মহব্বত না করে, তবে সে নিজের সত্তা ও পালনকর্তা উভয়টি সম্পর্কেই অজ্ঞ। কেননা, মহব্বত মারেফত তথা চেনা ও জানার ফল। মারেফত না হলে মহব্বতও হবে না। মারেফত দুর্বল হলে মহব্বতও দুর্বল হবে এবং মারেফত শক্তিশালী হলে মহব্বতও শক্তিশালী হবে। এ কারণেই হযরত হাসান বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রবকে চিনবে, সে তাঁকে মহব্বত করবে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চিনবে, সে তাঁর প্রতি অনাসক্ত হবে। একথা কল্পনাও করা যায় না যে, মানুষ

নিজের সত্তাকে মহব্বত করবে, অথচ রবকে মহব্বত করবে না। কারণ, রবের মাধ্যমেই তার সত্তার প্রতিষ্ঠা। যে ব্যক্তি প্রখর সূর্যকিরণে অতিষ্ঠ হয়ে ছায়াকে মহব্বত করে, সে বৃক্ষকেও মহব্বত করবে, যার মাধ্যমে ছায়া প্রতিষ্ঠা পায়। ছায়ার সাথে বৃক্ষের যে সম্পর্ক, প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুরও আল্লাহর সাথে সে সম্পর্ক।

দ্বিতীয় কারণ, এমন ব্যক্তিকে মহব্বত করা, যে টাকা-পয়সা ও কথার মাধ্যমে সাহায্য করে এবং শত্রুর শত্রুতা দূরীকরণে ও অনিষ্ট প্রতিহরণে সহায়তা করে। বলা-বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি মহব্বতের পাত্র না হয়ে পারে না। এ কারণটি দাবী করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত করা যাবে না। কেননা, বাস্তবে আল্লাহ তা'আলাই অনুগ্রহকারী। কোন ব্যক্তি যদি তোমাকে তার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার দিয়ে দেয় এবং যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করার অধিকার প্রদান করে, তবে তুমি ধারণা করবে, এটা এই ব্যক্তির তরফ থেকে তোমার প্রতি অনুগ্রহ। অথচ এটা ভ্রান্ত। কেননা, এ অনুগ্রহের পেছনে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। এক, স্বয়ং অনুগ্রহকারীর অস্তিত্ব। দুই, তার ধন-সম্পদ থাকা। তিন, ধনের উপর তার অধিকার থাকা। চার, বিশেষভাবে তোমাকে দেয়ার তার ইচ্ছা। এখন প্রশ্ন, এই অনুগ্রহকারীকে কে সৃষ্টি করেছে? তার ধন-সম্পদ কে সৃষ্টি করেছে? তার ক্ষমতা ও ইচ্ছার সৃষ্টিকর্তা কে? তার মনে এ প্রেরণা কে সৃষ্টি করেছে যে, 'তোমাকে দান করার মধ্যে তার কোন পার্থিব অথবা পারলৌকিক উপকার আছে? এক কথায়, সব প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাই সব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তার অন্তরে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, তোমাকে দান করার মধ্যেই তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। সুতরাং সে তোমাকে দান করতে বাধ্য এবং এর বিপরীত করতেই পারে না। সুতরাং সে সত্তাই প্রকৃত অনুগ্রহকারী যিনি তাকে তোমার জন্যে বাধ্য করেছেন।

হাঁ, ধন-ভাণ্ডার সে ব্যক্তির অধিকারে থাকাটা অবশ্য ইঙ্গিত দেয় যে, সম্ভবত অনুগ্রহকারী সে-ই। এ সম্পর্কে জানা দরকার, এ ব্যক্তি দান করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের মাধ্যম হয় মাত্র। অর্থাৎ, তোমাকে দেয়ার জন্যেই আল্লাহ তাকে ধন-ভাণ্ডার দিয়েছেন। সুতরাং সে না দিয়ে কি করবে? সে তো পয়ঃপ্রণালীর অনুরূপ। পয়ঃপ্রণালী নিজের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করতে বাধ্য।

এ ছাড়া মানুষ যখন অনুগ্রহ করে, তখন নিজের প্রতিই অনুগ্রহ করে। অন্য কোন সৃষ্টির প্রতি তার অনুগ্রহ করা অসম্ভব। কারণ, মানুষ যখন দান করে, তখন তার বিনিময় পূর্বেই আন্দাজ করে নেয়— আখেরাতে সওয়াবের আকারে অথবা দুনিয়াতে দানশীলতার সুখ্যাতি অর্জন করা কিংবা অপরের মন জয় করে তাকে অনুগত ও বশীভূত করা ইত্যাদি। মানুষ কখনও তার ধন-সম্পদ পানিতে ফেলে দেয় না। কারণ, এতে কোন লাভ নেই। এমনিভাবে সে তার অর্থ-কড়ি অন্যের হাতে বিনা লাভেই তুলে দেয় না। তোমাকে যখন সে ধন দেয়, তখন তার উদ্দেশ্য তুমি নও; বরং তুমি তার অর্থ গ্রহণ করে তার উদ্দেশ্য হাসিলের ওসিলা হও মাত্র। অতএব, সে অনুগ্রহ তোমার প্রতি নয়— নিজের প্রতিই করে। তোমাকে দান করে সে বিনিময়ে যা পাবে, সেটা যদি তার কাছে প্রধান ও অগ্রগণ্য না হত, তবে সে কখনও তোমার হাতে ধন তুলে দিত না। অতএব, মহব্বত ও শোকরের যোগ্য সে নয়।

তৃতীয় কারণ অর্থাৎ, কোন ব্যক্তিসত্তাকে অনুগ্রহ না পেয়েও মহব্বত করা। এটাও মানুষের স্বভাবে নিহিত। উদাহরণতঃ এক বাদশাহ সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল, সে এবাদতকারী, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট। অপরদিকে অন্য এক বাদশাহ সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া গেল, সে অত্যাচারী, অহংকারী, পাপাচারী এবং প্রজার অধিকার খর্বকারী। তুমি উভয় বাদশাহ থেকে এতদূরে অবস্থান করছ যে, তাদের কোন অনুগ্রহ অথবা যুলুম তোমা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তুমি প্রথম বাদশাহকে মহব্বত এবং দ্বিতীয় বাদশাহকে ঘৃণা করবে। তোমার এই মহব্বতও আল্লাহ তা'আলার মহব্বত দাবী করে, এমনকি চায়, তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত না কর। কেননা, সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপাকারী তিনিই। তিনিই প্রথমে বাদশাহকে সৃষ্টি করে তাকে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন।

চতুর্থ কারণ অর্থাৎ, সৌন্দর্যশালীকে মহব্বত করা। এখানে মহব্বতকারী সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কোন উপকারের ভিত্তিতে মহব্বত করে না। এটাও মানুষের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। সৌন্দর্য দু'প্রকার। এক, বাহ্যিক, যা চর্মচক্ষে দেখা যায়। দুই, অভ্যন্তরীণ, যা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করা যায়। সৌন্দর্য মাত্রই অনুভবকারীর কাছে প্রিয়। যদি অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অনুভব করা হয়, তবে মহব্বত আন্তরিক হবে। যেমন, পয়গম্বর, ওলী ও সচ্চরিত্রবানদের মহব্বত। এক্ষেত্রে মহব্বত হয়; কিন্তু এই মাহবুবদের মুখমণ্ডল দৃষ্টির

অন্তরালে থাকে। তবে অভ্যন্তরীণ মুখমণ্ডল অর্থাৎ., তাদের গুণাবলী দৃষ্টির সামনে থাকে। উদাহরণতঃ কেউ রসূল অথবা সিদ্দীকে আকবর অথবা ইমাম শাফেঈকে মহব্বত করলে এর কারণ হবে, তাঁদের গুণাবলী তথা জ্ঞান-গরিমা তাকে মুগ্ধ করেছে। অথচ তাঁদের গুণাবলী আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর সামনে অসম্পূর্ণ। অতএব, আল্লাহর গুণাবলীর কারণে মহব্বত আরও বেশী হবে।

পঞ্চম কারণ অর্থাৎ, পারস্পরিক মিল হওয়া। মহব্বতের মধ্যে এরও দখল রয়েছে। কেননা, যে বস্তু যে বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল, সে সেদিকেই আকৃষ্ট হয়। এ কারণেই ছোটরা ছোটদেরকে এবং বড়রা বড়দেরকে মহব্বত করে। মিল কখনও বাহ্যিক বিষয়ের হয়ে থাকে। যেমন, ছোটদের মিল ছোটদের সাথে। আবার কখনও গোপন বিষয়ে হয়ে থাকে, যা অন্যেরা জানে না। যেমন, ঘটনাক্রমে দু'ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, অথচ তার পূর্বে কখনও একে অপরকে দেখে না এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের কোন আদান-প্রদান থাকে না। এ গোপন মিলও মানুষ এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে মহব্বত দাবী করে। কেননা, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে এমন অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে মিল রয়েছে, যার কিছু অংশ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা যায় এবং কিছু লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়; বরং সেগুলো যবনিকার অন্তরালে গোপন থাকতে দেয়াই সমীচীন, যাতে সাধকরা সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর নিজেরাই জেনে নেয়।

যে মিল লিপিবদ্ধ করার যোগ্য, তা হচ্ছে যেসব গুণ অনুসরণ করার আদেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, সেগুলোতে তাঁর নিকটবর্তী হওয়া। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

تخلقوا باخلاق الله

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে যাও।

অর্থাৎ, জ্ঞান-গরিমা, সহনশীলতা, অনুগ্রহ, কৃপা, অপরের কল্যাণ সাধন, জীবে দয়া, অপরের হিতাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি খোদায়ী গুণসমূহ অর্জন কর। কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটি গুণ মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। পক্ষান্তরে যে মিল পুস্তকে লেখা যায় না, তা এমন বিশেষ মিল, যা কেবল মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়— ফেরেশতাদের মধ্যে নয়। এদিকেই ইঙ্গিত

করা হয়েছে এই আয়াতে—

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -

অর্থাৎ, তারা আপনাকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন— রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অংশ। এতে বলা হয়েছে যে, রূহ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমার বাইরে। নিম্নোক্ত আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ -

অর্থাৎ, অতঃপর আমি যখন তাকে সুগঠিত করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ্ ফুঁকে দেব।

বলা বাহুল্য, এই গোপন মিলের কারণেই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন আদমকে সেজদা করতে। এই মিলের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে এ আয়াতে ঃ

اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ, হে আদম, আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি করেছি।

বলা বাহুল্য, মানুষ কেবল এ মিলের কারণেই আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

ان الله خلق ادم على صورته

অর্থাৎ, আল্লাহ আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃজন করেছেন।

এ থেকে কোন কোন স্বল্প-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে দেহ ও আকৃতি গড়ে নিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতেও এই মিলের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন ঃ আমি অসুস্থ হয়েছি, তুমি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করনি। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ ইলাহী, এটা কিরূপে সম্ভব? উত্তর হল ঃ আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল। তুমি তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করনি।

তুমি যদি তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করতে, তবে আমাকে তার কাছে পেতে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার এই মিল তখন প্রকাশ পায়, যখন মানুষ ফরয কর্মসমূহ পালন করার পর নফল এবাদতে মশগুল হয়। যেমন, অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ

لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به –

অর্থাৎ, বান্দা সর্বদা নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে মহব্বত করি। যখন মহব্বত করি, তখন তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে, তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে এবং তাঁর জিহ্বা হয়ে যাই, যাতে সে কথা বলে।

মোটকথা, মিল ও মহব্বতের একটি বড় কারণ, যা অধিক শক্তিশালী, উৎকৃষ্ট ও অচিন্তনীয়। এর অস্তিত্ব খুবই বিরল।

মহব্বতের উপরোক্ত পাঁচটি কারণই আল্লাহ তা'আলার মধ্যে আক্ষরিক অর্থে একত্রিত রয়েছে এবং সবগুলো উচ্চস্তরে রয়েছে। এমতাবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি বিশিষ্ট মনীষীগণের মতে একমাত্র আল্লাহর মহব্বতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। মানুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোন এক কারণে মাহবুব হয়, তবে অন্য ব্যক্তিরও সে কারণে মাহবুব হওয়া সম্ভব। এটা অংশীদারিত্ব, যা মহব্বতের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতার প্রমাণ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর চূড়ান্ত প্রতাপ ও সৌন্দর্যের গুণাবলীতে কোন শরীক বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আসল মহব্বতের হকদার সেই সত্তা, যাতে কখনও অপরের অংশীদারিত্ব নেই।

খোদায়ী মহব্বত শক্তিশালী হওয়ার উপায় ঃ আখেরাতে সে ব্যক্তি সর্বাধিক সৌভাগ্যবান হবে, আল্লাহ তা'আলার সাথে যার মহব্বত অধিকতর শক্তিশালী হবে। কেননা, আখেরাতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কাছে গিয়ে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করা। বলা বাহুল্য, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন আশেক তার মাশুকের কাছে যাবে, তার দীদারে চিরতরে ধন্য হবে, কোনরূপ বাধা থাকবে না এবং মালিন্য ও বিচ্ছিন্নতার কোন আশংকা থাকবে না, তখন কি অভাবনীয় খুশী ও অপার আনন্দই না তার অর্জিত হবে! কিন্তু এই আনন্দ মহব্বতের শক্তি অনুপাতে হবে। মহব্বত যত বেশী হবে, আনন্দও তত বেশী হবে।

দুনিয়াতে কোন ঈমানদার আল্লাহর মহব্বত থেকে খালি নয়। কিন্তু মহব্বতের আধিক্য যাকে এশ্ক বলা হয়, তা অনেকের মধ্যে নেই। এই এশ্ক অর্জনের উপায় দু'টি— দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং মন থেকে গায়রুল্লাহর মহব্বত বের করে দেয়া। কেননা, মন হচ্ছে পান-পাত্রের মত। যদি পাত্রে পানি থাকে, তবে তাতে সিরকা রাখার অবকাশ থাকে না। আল্লাহ তা'আলা কাউকে দুটি মন দেননি যে, একটির দ্বারা আল্লাহকে মহব্বত করবে এবং অপরটি দ্বারা গায়রুল্লাহকে মহব্বত করবে। আল্লাহকে সর্বান্তকরণে চাওয়াই হচ্ছে পরিপূর্ণ মহব্বত। যে পর্যন্ত অপরের দিকে মনোযোগ রাখবে, সে পর্যন্ত মন অপরের সাথে একপ্রকার মশগুল থাকবে এবং যে পরিমাণ অপরের সাথে মশগুল থাকবে, সে পরিমাণ মনে আল্লাহর মহব্বত কম হবে। এই একাগ্রতার দিকেই এ আয়াতসমূহে ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ –

অর্থাৎ, বলুন আল্লাহ, এরপর তাদেরকে তাদের অসার চিন্তায় খেলা করতে দিন।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا –

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, এরপর তাতে দৃঢ় থাকে।

কালেমায়ে তাইয়েবা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"— এর উদ্দেশ্যই তাই। অর্থাৎ কোন মাবুদ ও মাহবুব আল্লাহ ছাড়া নেই। বলা বাহুল্য, মাহবুবই মাবুদ হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ বলেন—

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ

অর্থাৎ, দেখতো, যে মাবুদ করে নিয়েছে তার খেয়ালখুশীকে?